বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

দখিনা

জুন ২০২২ সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

আনন্দধারা

পঁচিশে পা ...

স্মৃতির বন্দরে
ফিরে আসা ...
আনন্দধারা

আনন্দধারা
THE STREAM OF JOY

আনন্দধারা রজতজয়ন্তী বর্ষ

দখিনা বিশেষ সংখ্যা - ২০২২

সম্পাদক : বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মগোষ্ঠী : শর্মিলা রায়
শ্রীমন্ত মুখার্জী
সঞ্জয় চক্রবর্তী
এবং আনন্দধারা রিডার্স ফোরাম এর সদস্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ : আশীষ ভট্টাচার্য্য

অলঙ্করণ : প্রিয়া চক্রবর্তী, শিবাজী মিত্র

প্রকাশক : এস এম জি ইন্টারন্যাশনাল প্রো লিমিটেড

দখিনা পত্রিকা SMG International Pty Ltd দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ! প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোনো ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ ! রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ !

25

years of

LITERATURE

NOVELS

STORIES

AUTHORS

ART

and

an immense amount of love
and support from a
beautiful loyal readership
that have stood the test of times.

Thank You

FROM THE ENTIRE
ANANDODHARA FRATERNITY

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	8
ফিরে দেখা	স্মৃতীশ রায়	10
আনন্দধারা'র গল্প আর আমাদের কথা	শ্রীমন্ত মুখার্জী	13
পঁচিশ বছরের পথচলা	শর্মিলা রায়	16
বেস্টসেলার	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	18
রজতজয়ন্তী	ইন্দ্রাণী দত্ত	22
মনতারা	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	27
টিপ	সঞ্জয় চক্রবর্তী	31
রভস	অমর্ত্য দত্ত	32
নিষ্প্রয়োজন	সাহানা চৌধুরী	33
তোমার নাম	পায়েল দত্ত	35
বাব্‌ল	অসীম দাস	36
সওগাত	অমর্ত্য দত্ত	37
অমরত্বের প্রত্যাশা নেই	সৌমিক ঘোষ	38
নির্বাসনের কথন	তপনজ্যোতি মিত্র	39
অসীম উদাসের কাছে	তপনজ্যোতি মিত্র	41
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	42
কথকঠাকুর প্রলাপ	পারিজাত ব্যানার্জী	46
করোনা ডায়রী	সৌমিক বসু	53
আশমান-জমিন	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	56
চেনা মেয়ের জানা কথা	শ্যামলী আচার্য	69
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর	সুপর্ণা চ্যাটার্জী	74
ধার করা সময়	ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	77
যুক্তি শেষে	শাশ্বতী বসু	83
আনন্দধারা'র সাথে দু দশকের পথ চলা	সিদ্ধার্থ দে	90
আমার চোখে আনন্দধারা	অসীম দাস	94
বাংলা সাহিত্যের বিরল রূপ	নিমাই কর্মকার	95
আনন্দের গালিচা পেতে আনন্দধারা	সুবীর চ্যাটার্জী	97
আমার নিবেদন	রেজা হোসেইন	99
আনন্দধারা এক জীবনের অনন্য অনুভূতি	যুঁই	100
আনন্দধারা একটি বিশেষ প্রচেষ্টা	ঊর্মি চক্রবর্তী	102
ROBININA DOWNS	Sharmila Gupta	104
POST DEATH	Amit Kumar Deb	106
আমার বই পড়া	আশীষ ভট্টাচার্য্য	107
আনন্দধারা'র জন্মদিন	ডঃ দেবু মুখার্জী ও লালী মুখার্জী	109
তিন'এর পরে পাঁচ	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	110
রবীন্দ্রনৃত্য এক অবিনশ্বর কালজয়ী নৃত্যশৈলী	শ্রেয়সী দাস	121
প্রশ্ন	শর্মিলা গুপ্ত	123
আমার চোখে আনন্দধারা'র পঁচিশ বছর	সৌমিক বসু	124

সম্পাদকীয়

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দধারা বহিছে -

যত বদলায় ততই নাকি একরকম থাকে, এই প্রবাদের কথা আমরা তো সবাই জানি ! কিন্তু যত বয়স বাড়ে তত তরুণ হয় এমন কথা আমরা না জানি না মানি !

সিডনী শহরে আনন্দধারা'র আমন্ত্রণে এসে মনে হলো ওই কথাটাই জানতে এবং মানতে হবে ! মেলবোর্নের বাংলা সাহিত্য সংসদের আহ্বানে অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার আগেই অবশ্য আমি আনন্দধারা'র নামের সঙ্গে পরিচিত ! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিংবদন্তী হয়েও যিনি আমার বা আমাদের সবার সুনীল'দা ছিলেন, আনন্দধারা'র গল্প করতেন এবং সেই গল্পে হামেশাই চলে আসত আনন্দধারা'র প্রাণপুরুষ শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম ! সেই উচ্চারণ যে অকারণ নয় তা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম সিডনীতে এসে !

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালীর ঘরে ঘরে বাংলা পত্র পত্রিকা'এবং বাংলা বই পৌঁছে দেবার যে ব্রত নিয়েছিল আনন্দধারা, আজ তাতে আরো গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে ! আসলে লেখক পুরনো হন কিন্তু পাঠক কখনো পুরনো হন না ! প্রতিটি নতুন লেখার সঙ্গে পরিচয়ের পর নতুন করে প্রাণিত হন তিনি ! লেখক মনে জায়গা পেতে চান, পাঠক মনের পরিধি বাড়িয়ে চলেন রোজ ! আর আনন্দধারা সেই বিন্দু যেখানে লেখক এবং পাঠকের মন মিলে তৈরী হয় এক মনের মহাদেশ !

মনের মহাদেশ নাকি মনের মহাবিশ্ব ? অষ্ট্রেলিয়ার কোনো বাঙালীর হাতে যখন 'দেশ' পত্রিকা দেখি কিংবা কারো ড্রয়িংরুমের টেবিলে দেখি 'সানন্দা' অথবা 'আনন্দমেলা' কিংবা অন্য কোনও সাহিত্য পত্রিকা তখন অনুভব করি যে আনন্দধারা নীরবে নিজের কাজ করে চলেছে বলেই অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বাঙালী লেখকদের কন্ঠ সরব হয়ে উঠেছে !

সেই লেখকরা যে কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে লিখছেন তা কিন্তু নয় ! দিল্লী, গৌহাটি, আগরতলা, মুম্বাই-এর পাশাপাশি মেলবোর্ণ কিংবা সিডনী থেকেও জন্ম নিচ্ছে নতুন লেখা, নতুন লেখক ! তাই মেলবোর্ণের ছন্দসী বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মুগ্ধ পাঠক জন্ম নিচ্ছেন কলকাতায় ! সেই একই পাঠক লুৎফর রহমান খানের প্রবন্ধ অথবা সঞ্জয় চক্রবর্তী'র কবিতা কিংবা শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জমাটি গল্পের অপেক্ষাতেও রয়েছেন !
তাইতো বললাম মনের মহাদেশ থেকে মনের মহাবিশ্ব, আনন্দধারা'র ইতিহাস আসলে প্রবাসী বাঙ্গালীর মননের জয়যাত্রার ইতিহাস !

ইতিহাস স্মারক চায়, চায় মাইল ফলক ! আনন্দধারা'র সেই স্মারকের নামই 'দখিনা' !

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে পত্রিকার যাত্রা শুরু, আজ আনন্দধারা'র পঁচিশতম বর্ষে সেই পত্রিকার রোশনাই যেন সিডনীর অপেরা হাউসের চোখ ধাঁধানো আলোকেও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ফেলবে !

ঠিক বললাম না বোধ হয় ! আনন্দধারা'র আলো তো চোখের বাহিরে নয় কেবল মনের ভিতরেও দেখা যায়, আনন্দধারা'র পঁচিশতম বর্ষে প্রকাশিত দখিনা'র পাতায় পাতায় ! ইন্দ্রানী দত্ত, তপনজ্যোতি মিত্র কিংবা অমর্ত্য'র লেখার পাশাপাশি আরো অনেক লেখা পড়তে পড়তে আপনাদেরও আমার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে দেখব !
এই স্বপ্নতো দেখতেই পারি !

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ই জুন ২০২২

ফিরে দেখা

স্মৃতীশ রায়

আনন্দধারার প্রথম অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমার "আমাদের কথা" লেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরপর সব অনুষ্ঠানেই লিখেছি আমাদের কথা। আজ পঁচিশ বছর পূর্তিতে বিগত দিনের কিছু স্মৃতিচারণা।

আনন্দধারার জন্মলগ্ন ১৯৯৭ সালে কোন এক মধ্যাহ্নে। উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা এবং বাংলা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার। উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমন্ত মুখার্জী। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমন্ত কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার South East Asia র প্রতিনিধি হিসাবে নিয়মিত ভাবে আনন্দবাজার পত্রিকা ও নানা সাহিত্য পত্রিকা আনা শুরু করে। সেই সঙ্গে আনতে থাকে পূজা সংখ্যা ও দুই বাংলার সাহিত্যিকদের লেখা বই। প্রবাসে বসে নিয়মিত ভাবে আনন্দবাজার হাতে পাওয়ার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা সেই সময়ে যা ছিল অচিন্তনীয়। আনন্দধারার উদ্যোগে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হয়েছিল Ashfield Town Hall এ। বিকেল চার'টে থেকে সন্ধ্যে সাত'টা পর্যন্ত ছিল Art and Painting Exibition - তারপর গানের জলসা। Art Exibition এ ছিল স্থানীয় ভারতীয় ও বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা ছবি,কার্টুন,ও কোলাজের প্রদর্শনী। এরকম একটি প্রদর্শনী আগে কখনো সিডনীতে হয় নি। তাই উৎসাহভরে অংশ নিয়েছিলেন অনেকেই এবং সেদিন ভিড়ে উপচে পড়েছিল টাউন হল। Exibition 'র সমস্ত ছবিগুলোকে সুন্দর ভাবে আলো দিয়ে সাজিয়ে display করার দায়িত্ব নিয়েছিল অরিজিৎ সেন। সেদিনের প্রদর্শনীতে বিক্রি হয়েছিল বেশ কিছু ছবি। এর পর প্রতি বছরই একটি বা দুটি অনুষ্ঠান হয়েছে। এতে গান করেছেন, বাচিক অভিনয় করেছেন স্থানীয় শিল্পীরা।

সব অনুষ্ঠানই যে মসৃণ ভাবে হয়েছে তা বলি কি করে।

কোনো এক বছরে অনুষ্ঠান চলছে Ashfield Town Hall এ। বিরতি পর্বে চলছে চা, সিঙ্গারা,নিমকি বিক্রি। Coupon র দায়িত্ব আমার উপর। ক্যাশ বক্স সামনে নিয়ে গুছিয়ে বসেছি কাউন্টারে। হঠাৎ একজন কোথা থেকে ছুটে এসে ক্যাশ বক্স তুলে নিয়ে ছুট। সম্বিৎ ফিরে পেতেই ছুটলাম তার পিছনে চোর চোর আওয়াজ দিয়ে। কিন্তু সে তখন মরিয়া। টাউন হলের চত্বর আলো আঁধারি, এবং সেখানে বসে চা খাচ্ছেন অনেকেই। আমার আর্তনাদ শুনে এক সহৃদয় চা প্রেমিক তাঁর পা টা একটু বাড়িয়ে দিলেন। চোর বাবাজী পড়লেন উল্টে।ক্যাশ বাক্স থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো সব টাকা পয়সা। পরে কিছু উদ্ধার হলেও ক্ষতি হলো বেশ কিছু। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অর্ধ আমার কাটলো পুলিশের সঙ্গে - interview দিয়ে।

আনন্দধারার আমন্ত্রণে ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়াতে আসেন প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলী। সিডনী এয়ারপোর্টে পা দেয়ার পর থেকে পরবর্তী দু সপ্তাহ তাঁকে নিয়ে দুই বাংলার মানুষদের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখেছিলাম, তা অভূতপূর্ব। যে কোনো মানুষের সঙ্গে উনি যে কি সহজ ভাবে মিশে যেতেন তা স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে।
এবারে আসি সুনীলদাকে নিয়ে অনুষ্ঠানের কথায়।
অনুষ্ঠানটিতে সুনীলদার লেখা তিনটি ভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে আমরা স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম এবং সেটাই মঞ্চস্থ করেছিলেন স্থানীয় শিল্পীরা।

প্রথমেই আসেন অর্ধেক জীবনের এক চরিত্র নাদের আলি। অভিনয়ে ছিলেন শাহীন ভাই. সুন্দর ভাবেই শুরু হয়েছিল প্রথমটা। শেষ সংলাপটা ছিল "তুমি আরো বড়ো হও দাঠাকুর ,সারা বিশ্বে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ুক, সেই সঙ্গে ম্যাইযাপাড়ার নাম". এ বলেই ধীরে ধীরে স্টেজ থেকে প্রস্থান। যাবার আগেই স্টেজ এ বসে থাকা সুনীলদা অন্ধকারের মধ্যে থেকে বলে ওঠেন "যেওনা না নাদের আলি ,শুনে যাও আমার কথা." বেচারা শাহীন ভাই ,স্ক্রিপ্টের বাইরে কোনো কিছু করার দুঃসাহস তার হয় নি। ধীর পায়ে মঞ্চ থেকে তাই বিদায় নিলেন শাহীন ভাই, হারিয়ে গেলো লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপচারিতার এক সুবর্ণ সুযোগ। পরে অবশ্য সুনীলদা নাদের আলির সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার অনেক স্মৃতি সবাইকে শোনালেন।

সুনীলদাকে প্রশ্ন করেছিলেন "সেই সময় "উপন্যাসের এক চরিত্র বিন্দুবাসিনী। চরিত্রায়ণে ছিলেন শার্মিলা রায়. অভিনয় শেষে তিনি প্রশ্ন করেন "লেখক, বিন্দুবাসিনীর চরিত্র টা কি আপনি অন্য কোনো ভাবে লিখতে পারতেন না? কেন তার এরকম নির্মম মৃত্যু হলো?" সুনীলদা উত্তরে বলেছিলেন "আমি চাইনি বিন্দুবাসিনীর এই নিষ্ঠুর পরিণতি। কিন্তু তখনকার দিনের সমাজ বিধবাদের জন্য এই নিদানই দিয়েছিলো, আমি ইতিহাস কে অবমাননা করি কি করে?" বলতে বলতে তাঁর গলা গিয়েছিলো ভিজে, হয়তো চোখের কোণেও ছিল দু ফোঁটা জল।
আশীষ ভট্টাচার্যের স্ক্রিপ্ট তৈরী হয়েছিল "নীরার জন্য" কবিতাটি ভিত্তি করে। নীরারূপী শম্পা ঘোষ দস্তিদার, তাঁকে নীরার আসল পরিচয় জানার চেষ্টা করলেও কবি সহাস্যে সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন।স্বাতীদি ও নির্বিকার।
সুনীল গাঙ্গুলি যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে সবার অদম্য উৎসাহ। সিডনীর কাছে Blue Mountain এ বেড়াতে গেছেন। হঠাৎই এক ঝাঁক ছেলে মেয়ে ঘিরে ধরল তাঁকে। তাঁর দিকে ছুটে এলো নানা প্রশ্ন, উঠতে লাগলো ছবি - সহাস্য মুখে সুনীলদা সব সামলালেন। এক সময় দেখি সুনীলদা স্তব্ধ হয়ে

চেয়ে আছেন Blue Mountain এর উপরের নীল আকাশের দিকে - যেন হারিয়ে গেছেন, ডুবে গেছেন অন্য এক জগতে – হাতে পুড়ছে সিগারেট - মাথার ওপরে অনেক লরিকেটের ওড়াউড়ি, কিচির মিচির - পাশে didgeridoo র গুরুগম্ভীর আওয়াজ - সব মিলে মিশে এ এক অন্য সুনীল।

যতদূর মনে আছে দখিনা পত্রিকাটির উদ্বোধন হয় সুনীলদার হাত ধরে. তিনি নিজেই এই পত্রিকার নামকরণ করেন।

আধ্যাত্মিক জগৎটা আমার কাছে কিছুটা ভাসা ভাসা। কিন্তু শীর্ষেন্দুদার সঙ্গে কথা বললেই মনটা যেন এক উচ্চমার্গে চলে যেত। তাঁর কথা শুনলে আপনা থেকেই মন শ্রদ্ধায় নুইয়ে আসতো। তিনি এমনই এক অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব।ওঁনার কাছ থেকে শুনেছিলাম অনেক নামকরা সাহিত্যিক ও কবিদের গল্প।ওঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হত উনি যেন বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের এক encyclopedia।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর পর ও আনন্দধারায় আমন্ত্রণে এদেশে এসেছেন অনেক সাহিত্যিক ও কবি - সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, হর্ষ দত্ত, অপূর্ব দত্ত, তিলোত্তমা মজুমদার, আবদুল্লা আবু সৈয়দ, শ্রীজাত, নবকুমার বসু, সুবোধ সরকার প্রমুখেরা।এদের সবাইকে নিয়ে আয়োজিত হয়েছে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

সময় ও প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান গুলি সংক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু থেমে যায়নি শ্রীমন্ত মুখার্জির উৎসাহ। তাই যখন দেখি সান্ধ্য আড্ডায় শ্রীমন্ত থেকেও নেই - চোখে অন্যমনস্কতা - মুখে মৃদু হাসি তখনি বুঝি ওর মাথায় ঘুরছে আগামী দিনের স্বপ্ন।

পঁচিশ বছর আগে যে চারা টা পোঁতা হয়েছিল আজ সেটা মহীরুহ না হলেও সগর্বে মাথা উঁচু করে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে - আর তাকে ঘিরে ভিড় করেছে অনেক নতুন মুখ, নতুন উৎসাহ। আনন্দধারায় পঁচিশ বছর পূর্তিতে আমার একান্ত কামনা আরো নতুন অঙ্গীকারের জন্ম হোক, নতুন উদ্দমে এগিয়ে চলুক শ্রীমন্তর মুখার্জির স্বপ্ন "আনন্দধারা"।

আনন্দধারা'র গল্প আর আমাদের কথা ১

শ্রীমন্ত মুখার্জী

আনন্দধারা কি, কে, কেন, কখন, কোথায়? এই প্রশ্ন গুলো অনেকবার উঠেছে। বহু শুভানুধ্যায়ী, পাঠক, পাঠিকা, জনসাধারণ কৌতূহল প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন বা করেন নি কিন্তু একটা প্রবাহ বয়ে চলেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এটাই বাস্তব। বিভিন্ন কাজে সামিল হয়েছেন বহু স্বেছাসেবী, সাহিত্যপ্রেমী, সংস্কৃতিমনা মননশীল মানুষ। একটা কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচে আনন্দধারা পথ চলেনি। সঙ্গীতসন্ধ্যা, সাহিত্যবাসর, অঙ্কনচিত্র প্রদর্শনী, বই এবং পত্র পত্রিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সমসাময়িক বিষয় এবং চিন্তানায়কদের ভাবনা চিন্তা নিয়ে বিতর্ক আড্ডার আয়োজন! রজত জয়ন্তী বর্ষে নবতম সংযোজন গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মানুষদের, ডোকরা এবং অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে সেতু বন্ধন করে তাদের শিল্পকর্ম আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বৃহত্তর বিশ্বের দরবারে উপস্থাপনা, বিক্রয়ের প্রচেষ্টা এবং সেই প্রান্তিক মানুষগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে সুফলের ভাগিদার করে তোলা।

এক কথায় বলতে গেলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যৌথ উদ্যোগ কেন্দ্র করেই আনন্দধারা'র জন্ম এবং পথ চলা। এই সমস্ত কর্মকান্ডে অর্থের প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু অর্থটাই মুখ্য নয় সমস্যার সমাধানটা, মননশীল বিনোদন এর আয়োজন, সৃষ্টিশীলতার আদান প্রদান এর মাধ্যমে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই ছিল লক্ষ্য। সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে।

২৫ বছর পেরিয়ে এসে আজ আনন্দধারার রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনায় ইচ্ছে আছে বিচিত্র সব ঘটনা, সৃষ্টিশীল খেয়ালী মানুষের সান্নিধ্য আর নেপথ্য কাহিনীর মালা গেঁথে ধারাবাহিক ভাবে নিবেদন করার আপনাদের জন্য। এই দখিনা বিশেষ সংখ্যা দিয়েই তার শুরু হোক।প্রথম অধ্যায় - প্রথম প্রশ্ন - হঠাৎ ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়াতে এসেই বাংলা বই, পত্র, পত্রিকা আমদানি'র ব্যবসা শুরু কেন?

তখন সদ্য অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছি। ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের প্রবাস জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়! কর্মসূত্রে আমেরিকা'র বোস্টনশহরে কিছুদিন কাটাবার পর পাকাপাকি ভাবে ক্যাঙ্গারুর দেশে পাড়ি। অভিবাসনের কাগজ পত্র অনুযায়ী আমরা প্রথম দিন থেকেই অষ্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা পরিভাষায়যাকে বলে "পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট"। খাতায়কলমে যাই থাকুক বাস্তবহলো আমরা এসে পড়লামএক নির্বান্ধবপুরীতে। এ দেশেরএকজন মানুষকেও চিনতাম না। ঘটনাচক্রে আমাদের অস্ট্রেলিয়াপ্রবাস জীবনের প্রথম দু'মাস কেটেছিল একডাচ মহিলার সাথে অ্যাপার্টমেন্টশেয়ার করে।

নতুন কর্মস্থলে কাজের প্রচন্ড চাপ! বাড়ি ফিরতে রাত নটা, দশটা বেজে যায় রোজ। এসে খেয়েদেয়েই ঘুম আবার পরেরদিন ভোর বেলা উঠে অফিস। আমার গিন্নীর ডাকনাম মিষ্টি। মিষ্টির বেশির ভাগসময় তাই কাটতো বইপড়ে। বাংলা বইয়ের ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসছে, নতুন পত্র পত্রিকার কোনো যোগান নেই। সাংঘাতিক একটা অবস্থা। টিভি তে তখনস্থানীয় খবর আর এস.বি.এস প্রোগ্রামশুধু দেখা যেত। প্রি-ইন্টারনেট, প্রি-ফেসবুক, প্রি-স্যাটেলাইটটিভি, সে যুগের কথা ভাবলে হয়তো আজকের এক্স-প্রজন্ম আমাদের গুহাবাসী, প্রস্তর যুগের কাছাকাছি কোনো সময়ের মানুষ বলে মনে করতে পারে। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কিন্তু আমার এবং অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী গার্গী মুখোপাধ্যায় এর কাছে বিরাট সমস্যা ছিল মনের খোরাক জোগাড় করা। মানে বাংলা বই, পত্র পত্রিকা। কোথায় পাবো সেই যক্ষের ধন, প্রিয় বাংলা সাহিত্য সম্ভার! দেশের সঙ্গে যোগসূত্র তখন প্রিয়জনদের সাথে স্বল্পক্ষণের ব্যয়বহুল টেলিফোন কলআর দৈনন্দিন রান্নার চাল, ডাল, তেল মশলা আনতে ভারতীয় বা বাংলাদেশী মনিহারী দোকান।

আমাদের বাড়ির কাছে হাঁটা পথে ছিল একটি বাংলাদেশী গ্রসারী স্টোর ‘মৌরী স্পাইসেস’। সেখানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই খোঁজ নিতাম কোনো বাংলা পত্র পত্রিকা এসেছে কি না। মনে আছে কখনো কখনো দু একটা

পুরোনো সানন্দা বা দেশ পত্রিকা ভাগ্যক্রমে পেয়ে যেতাম। ব্যাস ওইপর্যন্তই। তারপর আবার সেই পথ চেয়ে বসে থাকা কবে আবার একটি বা দুটো পত্রিকা পাবো। আমি দোকানে গেলেই মিষ্টি পথ চেয়ে বসে থাকতো আমি বোধ হয় অন্যান্য জিনিসের সাথে বাংলা পত্রিকা হাতে নিয়ে ঢুকবো।

দিনের পর দিন হতাশা বাড়তে লাগলো। সদ্য পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সাথে ডিনার পার্টিতে প্রায়ই আলোচনা হতো, " আহা যদি অষ্ট্রেলিয়াতে বসে দেশ, সানন্দা, আনন্দলোক, আনন্দমেলা হাতে পেতাম - কি ভালোই না হতো । " একদিন ঘটনাচক্রে এক বন্ধু বললো, "আরে শ্রীমন্ত তুমি নিজেই কলকাতা থেকে বাংলা পত্রিকা নিয়মিত আনবার ব্যবস্থা করোনা কেন?" পাগলার সাঁকো নড়িয়ে দিলেই হলো - মাথায় ঘুরতে শুরু করলো এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। অষ্ট্রেলিয়াতে নিয়মিত বাংলা বই আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো কিছু না ভেবে, কোনো পরিকল্পনা না করেই হঠকারিতার সঙ্গে সরাসরি ফোন করলাম কলকাতা'র আনন্দবাজার অফিসে। খুবই সৌভাগ্য আমার, তখন আনন্দবাজারের এক্সপোর্ট ম্যানেজার ছিলেন শ্রীমতি মধুমিতা সিনহা। উনিঅত্যন্ত আগ্রহ এবং আন্তরিকতা সহকারে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন প্রতিটি পদক্ষেপ! কি ভাবে ইম্পোর্ট করতে হবে, ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে। আনন্দধারা চিরকৃতজ্ঞ শ্রীমতি মধুমিতা সিনহা এবং ওনার পতিদেবতা বন্ধনব্যাংকের চেয়ার পারসন ডাঃ অনুপ কুমার সিনহা'র কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আনন্দধারাকে পথ দেখাবার এবং সহযোগিতা করার জন্যে।

অস্ট্রেলিয়াতে বাঙালী পাঠকের হাতে নিয়মিত বাংলা বই, পত্রিকা না পাওয়ার সমস্যা সমাধান করার হঠকারী সিদ্ধান্তে জন্ম নিলো আনন্দধারা। সেই ট্র্যাডিশন আজ ও চলছে বিগত ২৫ বছর ধরে। আবোল তাবোল এই কর্মযজ্ঞেরর খেয়ালী পথে সঙ্গী হয়েছেন বহু সৃষ্টশীল মানুষ এবং দুটি প্রজন্ম। সেই সব আজব কাহিনী এবং নেপথ্য বাহিনীর গল্প শোনাবো সুযোগ সুবিধা মতো যদি মানুষের আগ্রহ থাকে।

পঁচিশ বছরের পথচলা

শর্মিলা রায়

আনন্দধারার পঁচিশ বছর - এক দীর্ঘ পথচলা - এক স্বপ্নের তিল তিল রূপায়ণ। ভাবতে অবাক লাগে এই দীর্ঘ পথ হেঁটেছি আনন্দের ধারায় নিজেকে সিক্ত করতে করতে। আনন্দধারা তো সিডনীর বুকে শুধু একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে নয় – এ তো আমাদের ভালোবাসার জায়গা - দৈনন্দিন গতানুগতিকতার বাইরে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। পঁচিশ বছর পিছনে ফিরে আনন্দধারার জন্মলগ্নের দিকে যদি তাকাই এখনো অবাক হই - কারণ এরকম একটি অভিনব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্টানের জন্ম হয়েছিল কিন্তু একটুও ঘটা করে নয় - খুব সাধারণ ভাবে - এক দ্বিপ্রাহরিক আড্ডায়। কোনো মিটিং হয় নি - হয় নি কোনো সংবিধান রচনা - ছিলো না কোনো সদস্য পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। আবার অবাক না হয়ে এটাও ভাবা যায় যে কোনো উদ্যোগ নিতে গেলে বোধহয় একটা স্বপ্ন ও স্বপ্ন সফল করার অদম্য ইচ্ছা আর সাহস থাকলেই চলে - যেটা আনন্দধারায় রূপকার শ্রীমন্ত মুখার্জির যথেষ্টই ছিল। সঙ্গে যোগ দিলাম আমরা ও আরো অনেকে। শুরু হলো ছক কাটা জীবনের বাইরে এক অন্য রকম পথ চলা।

শুরু থেকেই আনন্দধারা ব্যতিক্রমী সংস্থা। সবার জন্য অবারিত দ্বার – সংস্কৃতিমনা সকলের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সব সময় উৎসুক। আনন্দধারা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে দুই বাংলার মেল্ বন্ধন ঘটেছে - এছাড়াও অংশ নিয়েছেন ভারতের নানা প্রান্তের শিল্পীরা - বাংলা গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছেন আফগানের তবলাবাদক। শিল্পীরা ছাড়াও আনন্দধারায় অনুষ্ঠানগুলিকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন কত কত গুণী মানুষ। স্টেজ সাজানো, পরিচালনা, আলোক সম্পাত, শব্দ সংযোজনায় উৎসাহভরে সাহায্য করেছেন। শুধু শিল্প কে ভালোবেসে, সৃজনশীলতার তাগিদে আনন্দধারার কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছেন এঁরা। এই সব গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করে ধন্য হয়েছি। এঁরা কেউ কেউ সঙ্গে থেকে গেছেন আনন্দধারায় আর কেউ হয়তো অনুষ্ঠান শেষে বিদায় নিয়েছেন।কিন্তু তাঁদের সাথেও এখনো যখনই দেখা হয় পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তাঁরা ঝলমলিয়ে ওঠেন। সার্থকনামা হয়ে ওঠে আনন্দধারা।

দেশ থেকে আনন্দধারার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিডনী তে এসেছেন বাংলা সাহিত্য জগতের খ্যাতনামা লেখক লেখিকার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবকুমার বসু,

তিলোত্তমা মজুমদার, আবদুল্লা আবু সৈয়দ,অপূর্ব দত্ত, সুবোধ সরকার, শ্রীজাত, হর্ষ দত্ত উজ্জ্বল করেছেন আনন্দধারার সাহিত্য সন্ধ্যা। খুব কাছে থেকে দেখেছি এঁদের। আমি বড় হয়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কে idolize করে। 'আত্মপ্রকাশ', 'একা এবং কয়েকজন' এর লেখকের নাম নাম শুনলেই কলেজে আমাদের সবার হৃদয়ে দোলা লাগতো। সেই লেখকের সঙ্গে সিডনীর নানা জায়গায় বেড়াতে যাওয়া - মধ্যাহ্নভোজ করতে করতে কবিতা থেকে বেগুন ভাজার আলোচনা, রাত জেগে আড্ডা সব যেন স্বপ্নের মত। কখনো কি ভেবেছি শীর্ষেন্দুদা দা'র সঙ্গে অনায়াসে ঘরোয়া গল্প করতে পারবো! তিলোত্তমা কে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে তিন বন্ধুর পথ ভুল - তাও ঘটেছিলো। জানতামই না শ্রীজাত এমন সাধাসিধে ভালোমানুষ – একবারের আবদারেই শুধু কবিতাই নয় গান ও শোনাতে রাজি হয়ে যান। ভাবিনি সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে সমরেশ'দা কে ঘিরে বসে আমরা শুনবো চা বাগানে তাঁর ছেলেবেলার গল্প। স্বর্গতা সুচিত্রা দি'র সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন cheese নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছিলাম - বলেছিলাম কলকাতায় গেলে ওঁর বাড়িতে দেখা করতে যাবো cheese নিয়ে। হেসে বলেছিলেন, 'না নিলে ঢুকতেই দেব না'। ঢুকতে আর হয় নি যদিও। সদা হাস্যমুখী সুচিত্রা দি আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন তার কিছু পরেই। এইসব ব্যাক্তিত্বের কাছাকাছি আসতে পেরেছি শুধু আনন্দধারায় জন্যই।তাই আনন্দধারার প্রতি আমার ঋণ থাকবে আজীবন। এঁদের নিয়ে আয়োজিত সাহিত্য সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি ওঁদের রচনা কেন্দ্র করে নিজেরা কিছু লিখে পরিবেশন করবো। রাত জেগেছি সৃষ্টির আনন্দে। সেও তো অনেক পাওয়া। আর এই যে এখন আনন্দধারার পঁচিশ বছর পূর্তির বিশেষ সংখ্যার এডিট এর কাজ করছি, লেখা পড়ছি, নতুন লেখকদের সাথে পরিচিত হচ্ছি এতে ও কি যে আনন্দ পাচ্ছি!

ছোটবেলা থেকে আমি যাকে বলে বইয়ের পোকা। আমাদের বাড়ির সব্বাই তাই। সাপ্তাহিক দেশ, শুকতারা, পুজো সংখ্যার যাবতীয় বই আমাদের বাড়িতে রাখা হতো এবং বইয়ের দখল নিয়ে ঝগড়া এড়ানোর জন্য বেশ একটা roster চালু ছিল। এ দেশে এসে তাই বই বিহীন জীবন কাটানো যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল - সেই সময় আনন্দধারা ইচ্ছেপূরণের জাদুকাঠি ঘুরিয়ে দেশ থেকে নিয়মিত পত্র পত্রিকা বই আনা শুরু করলো। মনে আছে প্রথমবার আনন্দবাজার পত্রিকা আর দেশ হাতে নিয়ে বার বার গন্ধ নিচ্ছিলাম - দেশের গন্ধ - ভালো লাগার গন্ধ - স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠার গন্ধ। সুদূর প্রবাসে আমার মতোই দুই বাংলার সাহিত্যপ্রেমী বাঙালিরা আনন্দধারায় মাধ্যমে খুব সহজে বাংলা পত্র পত্রিকা, বই,পুজো সংখ্যা হাতে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হচ্ছেন। যে কোনো বই অর্ডার দিলেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত হাতে তুলে দিচ্ছে আনন্দধারা। সিডনীর নানা বই মেলা ও পুজো প্রাঙ্গনে সবসময়ই আনন্দধারার স্টল ঘিরে উৎসাহী ভীড়।

আনন্দধারার বিতর্কাড্ডা এক অভিনব প্রয়াস। রোববারের আয়েসী দুপুরে যেখানে সম সাময়িক বিষয়, সাহিত্য ও জীবনদর্শন নিয়ে চায়ের পেয়ালার তুফানের সঙ্গে মিশে যায় ঝালমুড়ি সহকারে আড্ডা। বিতর্কের বিষয় যাই হোক না কেন - জটিল বা সহজ - আড্ডার মিশেলে জমে ওঠে মৌতাত।

এভাবেই আনন্দ পাবার তাগিদে, নতুন কিছু করার তাগিদে আনন্দধারায় সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সিডনী ও দেশের গুনীজনেরা। তাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আনন্দধারা। যেহেতু কোনো বাঁধাধরা সদস্য পদ নেই তাই যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেকে আনন্দধারা সংস্পর্শেই থেকে গেছেন, আবার কেউ বা ক্ষনিকের আনন্দ আহরণ করেছেন। আনন্দধারা সবাইকে নিয়ে, সবার হয়ে সবার জন্য তির তির করে বয়ে চলেছে - আনন্দ বিলিয়ে চলেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর।

বেস্টসেলার

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাইভ টক শো' শুরু হওয়ার ঠিক আগে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সমরাদিত্য বটব্যাল বলে উঠলেন, হাওয়া ওঠে, হাওয়া নেমেও যায়। তাতে এক-আধটা জায়গায় পাশা পাল্টাতে পারে কিন্তু হাওয়ার জোরে কিস্তিমাত হয় না। তার জন্য অন্য জিনিস চাই।

-আপনার লিপ-বাম লাগবে? ছোট্ট আয়নাটা ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে সিরিয়ালের ব্যস্ত নায়িকা অমারাি জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা কাকে ঠিক বুঝতে না পারলেও সমরাদিত্য হাত বাড়িয়ে বললেন, শীতের মরশুমে ঠোঁট তো ফাটেই, কিন্তু মনে রাখবেন, কপাল ফাটে সংগঠন না থাকলে।

-সংগঠন মানে? অমারাত্রি জানতে চাইল।

ক্ষুব্ধ লেখক পিনাকপাণি সেনগুপ্ত অসম্ভব ধিক্কারের সে স্মরণ করলেন যে দুবছর আগে এই মেয়েটিই তাঁর কোচিঙে ছাত্রী ছিল।ভাগ্যিস এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার সমাজসেবী হওয়ার স্বপ্ন দেখে ফেলায় তিনি পাতার পর পাতা বক্তৃতা লেখার কাজ পেয়েছেন নয়তো এইসব মাথামোটাদের শিক্ষক হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়াও লজ্জার।

-ও স্যার আপনিই বলে দিন না। অমারাত্রি পিনাকপাণির দিকে ফিরল।

-সংগঠন মানে সেই আঁকশি যা দিয়ে আপনি গাছ থেকে ফলটা পেড়ে খেতে পারেন। এবার গাছে আম আছে এবং আপনার খাওয়ার ইচ্ছেও আছে কিন্তু হাতে আঁকশি না থাকলে কী করবেন আপনি? সমরাদিত্য চোখ নাচালেন।

-কী আবার করব, গাছে চড়ে বসব! আমি কিন্তু পারি! অমারাত্রি হেসে উঠল।

-তোমার মতো বাঁদরের ওই কাজটা না-পারাটাই অস্বাভাবিক হত। মুখ ফসকে বলে ফেললেন্ পিনাকপাণি। অমারাত্রি একটুও রাগ করল না, স্যার যে কী বলেন!

-ভুলভাল কথা না বললে, আজ ওনার এই অবস্থা হবে কেন? সমরাদিত্য বিরক্তি আর করুণা মেশানো একটা গলায় বললেন।

-আমার অবস্থা আপনি কীভাবে জানেন? পিনাকপাণি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

-আমি একা কেন, সবাই জানে; তিনদিন আগেই বইমেলায় মুস্তাফি অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স'এর দোকানে কী ঘটেছিল সেটা মনে আছে না ভুলে মেরে দিয়েছেন?

-আমাদের প্রোগ্রামটা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব, সে বিষয়ে কথা বলা জরুরি ছিল...

-আরে তার সময় আছে, পিনাকবাবু। কিন্তু সেদিনের কথা যা বলছিলাম... স্টলের ভিতর হঠাৎ করে ঘোষণা,

‘লেখক পিনাকপাণি সেনগুপ্ত আমাদের মধ্যে উপস্থিত, আপনারা যারা লেখকের অটোগ্রাফ পেতে চান তারা ওঁর বই কিনে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়ান।’

-ব্বাবা, ওই অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ভিড় কীরকম হামলে পড়ে আমার জানা আছে। সেবার বগুলায় অটোগ্রাফ না পেয়ে আমার ওড়নাটা টান দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কারা যেন। পরে শুনেছিলাম, সেটার অনেক টুকরো হয়েছে। সব ফ্যান একটা করে টুকরো নিয়ে গেছে।

-কিন্তু পিনাকবাবুর বই একটি টুকরোও হয়নি, অমা। কোনও হুড়োহুড়ি তো দূর, একটা লোকও বই নিয়ে এগিয়ে আসেনি সই করাতে।

-কী আজেবাজে বকছেন? সেই যে সৌম্যকান্তি বালকটি ...

-আরে সে তো, প্রকাশকের শালার ছেলে, ক্লাস এইটে পড়ে; একজনও বই কিনল না দেখে, প্রকাশক চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওই বাচ্চাটাকে দিয়েই এককপি... কিন্তু পরেরবার আপনার বই আর ওরা করবেন না।

-আপনি এতসব জানলেন কী করে?

-আহা, ওরা যে আমার ‘ভোটের লাট্টু; জাল্লিকাট্টু’ ছাপছে, এই পয়লা বৈশাখেই।

-আচ্ছা, দেখব সেই বই ক’খানা কাটে।

-কাটবে মানে? বেস্টসেলার হবে পিনাকবাবু। মিলিয়ে নেবেন।

-কিন্তু স্যার কি এতই খাজা লেখেন নাকি? আমাকে সেই ক্লাস ইলেভেনে কী সুন্দর করে লিখিয়ে দিয়েছিলেন, ‘ যৌন-সভ্যতা বিজ্ঞানের অভিশাপ না আশীর্বাদ’।

-কী লিখিয়েছিলাম? পিনাকপাণি গর্জে উঠলেন।

-ওহ, সরি-সরি।‘যন্ত্রসভ্যতা’ হবে। আসলে দুটোই এত কঠিন শব্দ...

-সহজ হোক বা কঠিন, দুটোই খুব কাছাকাছি শব্দ, অমা। দুটো ব্যবহার করেই মানুষ নিজের কামনা চরিতার্থ করে, মানে বাংলায় যাকে বলে ‘ডিজায়ার ফুলফিল করে’।

-বই বিক্রির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? পিনাকপাণি খচে গেলেন।

-আছে মশাই, আছে। নাটবল্টু মজবুত না হলে যন্ত্র চলে না, সংগঠন পোক্ত না হলে বইও চলে না। আপনার সংগঠন কোথায় যে বই বিক্রি হবে?

-ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেসটিং লাগছে কিন্তু! অমারাত্রি হাই তুলল একটা।

- কিছুই বুঝতে পারছি না। পিনাকপাণি মুখ ঘুরিয়ে হাঁচলেন একটা।

-দেখুন, ভোট থাকলেই যেমন হয় না, সেই ভোটকে বুথ অবধি, মায় ইভিএম’এর বোতাম অবধি নিয়ে যেতে হয় প্রার্থীকে, পাঠক থাকলেই তেমন হয় না, সেই পাঠককে ক্যাশ-কাউন্টার অবধি নিয়ে যেতে হয় লেখককেই। সমরাদিত্য মুচকি হাসলেন।

-মানে, প্রমোশন? বইয়ের ফিল্ডেও? অমারাত্রির চোখ বড় হয়ে গেল।

-অ্যাবসলিউটলি। ক্যান্ডিডেটের যেমন ইলেকশন এজেন্ট, লেখকেরও চাই সিলেকশন এজেন্ট! নইলে অত বইয়ের মধ্যে লোকে আপনারটা হাতে নেবে কেন? নেওয়ানোর জন্য বাজারে চারাপোনা ছেড়ে দিতে হবে। তারাই স্টলে স্টলে গিয়ে চেঁচাবে, ‘আচ্ছা কাল পিনাকপাণির যে বইটা হটকেকের মতো বিক্রি হয়ে গেল সবকটা কপি, আজ আবার সেটা বাঁধাই হয়ে স্টলে এসেছে কি’?

-উফফ, কান-মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে আমার। পিনাকপাণির মন সিগারেটের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সমরাদিত্যর উৎসাহ বেড়ে গেছে ততক্ষণে, এতেই ক্লান্ত হলে চলবে? এ তো সবে গ্রাউন্ডওয়ার্ক! কিন্তু শুধু ডোর টু ডোর দিয়ে এখন কোনও যুদ্ধই জেতা যাবে না। এখনকার স্লোগান হচ্ছে, ’মোবাইল ফর মোর’। আগে যে কাজটা করত ভাইটি, সেটাই এখন করবে আইটি। প্রত্যেক্ প্রার্থীর মতো, সব লেখকেরও নিজস্ব আইটি সেল থাকতেই হবে। ডে-নাইট, উইদিন দ্য হাউজ, অন দ্য রোড, তারা করে যাবে শুধু আপলোড!

-বইয়ের ছবি? অমারাত্রি জিজ্ঞেস করল।

-ধ্যাত! শুধু বই কেন? লেখকের বই, লেখকের সই, ভক্তবৃত্তে দাঁড়িয়ে হইচই! সবটাই ফেসবুকের ওয়ালে কাঁচা গোবরের মতো অহোরাত্র সেঁটে যেতে হবে। আর প্লেগের চেয়েও দ্রুতগতিতে সংক্রমণ ঘটাতে হবে সেইসব ছবির। খেয়ালে-বেখেয়ালে, দেয়ালে-দেয়ালে...

-এই পলিসিটা আমাকেও অ্যাডপ্ট করতে হবে। অমারাত্রি বলে উঠল।

-কেন? তুমিও বই লিখছ নাকি? পিনাকপাণি রিফ্লেক্সে বলে ফেললেন।

-স্যার কীভাবে যেন সব বুঝে যান! একটা বড় পাবলিকেশন থেকে অ্যাপ্রোচ করেছে। অমারাত্রি লজ্জা-লজ্জা গলায় জানাল।

-কিন্তু তুমি তো একলাইন বাংলাও জানো না!

-ভয় পাবেন না স্যার। আমি তো শুধু ডিক্টেশন দেব। ইন ইংলিশ। বাকি কাজটা তো করবে একটা রাইটার আর তারপর বিক্রির দায়িত্ব আমার ফ্যানরাই...

-ওই ওরাই আপনার সংগঠন অমা। ওদের ধরে থাকুন।

-ওরা আমাকে ছাড়বে নাকি? শুধু মাঝেমাঝে ওড়না টেনে নেয়...

-সংগঠন শক্ত করতে গেলে ওসব হ্যাজার্ডস একটু নিতে হয়। কেবল দেখতে হবে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা আছে নাকি! মানে আপনার সংগঠন শুধু আপনার কথাই শুনছে তো!

-আবার আপনি কঠিন, কঠিন...

-কঠিন নয়, অমা, সহজ। এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছিল বলেই পাঁচজন পাণ্ডব একশো কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে গেল। কারণ, অর্জুনের ছুটকোছাটকা বাদ দিলে, ওরা পাঁচজন তো কেবল দ্রৌপদীর কথাই শুনত; আর ওদের প্রতিপক্ষরা একশোটা বউয়ের কথা শুনতে গিয়ে...

পিনাকপাণির মনে হল, তিনি পাগল হয়ে যাবেন। আর তখনই দেখলেন, প্রকাশকের তেরোটা মিসড-কল, মোবাইলে।

স্টুডিওর ভিতর থেকে ডাক এসে গিয়েছিল। পিনাকপাণি তবু এককোণে সরে গিয়ে ফোন লাগালেন নিজের প্রকাশককে।

-আমি আসলে একটা টিভি প্রোগ্রামে...

-রাখুন প্রোগ্রাম। আপনি আমায় কী সমস্যায় ফেলেছেন, কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রকাশক থামিয়ে দিলেন পিনাকপাণিকে।

-কী সমস্যায় ফেললাম আবার?

-ওরে বাবা, আপনার বই বিক্রি যে হয় না, তা তো নিজেই দেখে গেছেন। তাই সেদিনের পর ওই বই আর গুদাম থেকে আনিনি আমরা। যে দু'কপি ছিল তার একটা তো আমার

-শোনাচ্ছি কি সাধে? আজ একটা দিল্লির কোম্পানি এসেছিল, তাদের প্রাইজ দিতে। ওদের প্রাইজের নাম, 'বেস্টসেলার'। আর, ব্রহ্মময়ী তারার কী খেলা দেখুন, সেই প্রাইজ পাচ্ছেন আপনি। নগদ তিনলাখ টাকা মশাই, ভাবা যায়!

-কিন্তু আমি কীভাবে?

- সেটাই তো রহস্য। ওরা খুঁজে খুঁজে দেখছিল, এবছরই পাবলিশড অথচ তাকে যার এককপি নেই, এমন বই কোন স্টলে ক'টা আছে? তা, ভানুমতীর খেল, আপনি ছাড়া তেমন আর কেউই ছিল না গোটা বইমেলায়।

-আমি তার মানে এতটাই হতভাগা?

-হতভাগা? এককপিও যদি রাখতাম তবে জুটত প্রাইজটা আপনার কপালে? রাখিনি বলেই তো ওদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অবলীলায় বলে দিলাম, 'অল সোল্ড আউট'। ব্যস, দু'ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা। এবছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার, 'বেস্টসেলার' প্রাইজ পাচ্ছেন... ফিফটি পার্সেন্ট টাকা তো আপনার আমাকে দেওয়া উচিৎ মশাই।

পিনাকপাণির মনে হল, ওঁর হার্ট অ্যাটাক হবে, এক্ষুনি।

-ও মশাই টাকা চাইছি ভেবে চুপ করে গেলেন নাকি? শুনুন, অত চশমখোর নই। আপনার টাকা আপনারই। কিন্তু ইন্টারনেটে প্রাইজ ঘোষণার পর থেকে তো হুজুগে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছে আপনার ওই খাজা, সরি তাজা মালের জন্য। এখন আমি কী করি?

-বেচে দিন। চারশো কপি তো ডাঁই হয়ে আছেই আপনার গুদামে! সরি, তিনশো আটানব্বই।

- সে তো বেচবই। কিন্তু ফার্স্ট এডিশন অল সোল্ড আউট বলার পর, ওই বই ওভাবে বেচলে তো জেলে যেতে হবে। এখন, প্রত্যেকটা বইয়ের 'প্রথম প্রকাশ'এর জায়গায়, 'দ্বিতীয় সংস্করণ' সাঁটতে হবে। এবার সবাই বইমেলার জন্য উদয়াস্ত মাঠে খাটছে; তাহলে কে কাটবে কাগজ? 'দ্বিতীয় সংস্করণ' লিখবে কে? গুদামে তো একা রতনলাল, তা তারও চোখে ছানি...

-কিন্তু এসবের আমি কী জানি?

-অমন এড়িয়ে গেলে তো চলবে না মশাই। আমার ছোট্ট সংগঠন। আর আপনিও তো তার অংশ, বলুন? তাই আমি বলছিলাম কি যে আজকের রাতটা আপনি আমার গুদামেই

থাকুন। না, একা নয়, আপনার বউকেও আমি রাজি করিয়ে ফেলছি... তিনলাখ শুনলে বউদি নিশ্চয়ই...

-মানে?

-মানে হাত হাত মিলিয়ে কাজটা দু'জনে নামিয়ে দিন। আমি টিভি স্টুডিওর সামনে আমার গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বউদিকেও চলে আসতে বলছি ওখানে...

-আপনি তার চেয়ে একটা গুলি করে মেরে ফেলুন না আমাকে!

-বালাই ষাট! আমি এক্ষুনি রতনলালকে দিয়ে বিরিয়ানি আনাচ্ছি আপনাদের দুজনের জন্য। গুদামে একটা চৌকিও আছে। বিরিয়ানি খেয়ে, দু'জন মিলে পেস্ট করতে করতে ভাবুন না, আজ আবার আপনাদের ফুলশয্যার দ্বিতীয় সংস্করণ! তবে সেই ছবি আবার ফেসবুকে আপলোড করবেন না যেন!

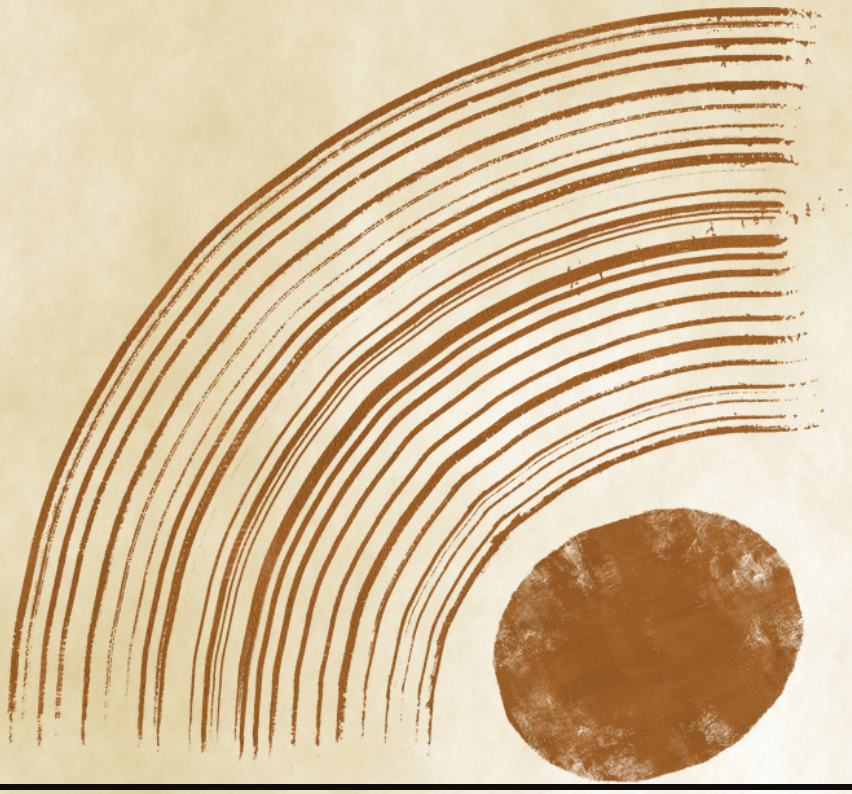

রজতজয়ন্তী

ইন্দ্রাণী দত্ত

একদল মরা মানুষের মাঝখানে ওদের দেখা যাচ্ছিল; ব্যাকড্রপে তিনরঙা ডোরাকাটা কাপড়ের ওপর আলোর মালার ট্রাফ আর ক্রেস্ট, তার পিছনে বাঁশের খুঁটির আভাস স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ল্যামিনেটেড ছবি ওদের দেওয়ালে ঝুলে রয়েছে আজ পঁচিশ বছর; সন্ধ্যার পরে, টিউবলাইটের আলো রিফ্লেক্ট করলে ছবির মানুষদের ছায়াপিণ্ড মনে হয়; দিনের আলোয় সবার মুখ আবার স্পষ্ট দেখা যায়, হাল্কা ধুলোর সর নজরে আসে। তারপর তাপস হাত বাড়াল, ছবি পেড়ে এনে আঙুল দিয়ে ধুলো মুছল, তারপর গলা তুলে এক টুকরো পুরোনো কাপড় চাইল। ঝাড়ন কাঁধে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে স্বাতী দেখছিল, তাপসের আঙুল ধাক্কাপাড় ধুতি, কাজকরা পাঞ্জাবি, জমকালো শাড়ি গয়নার মানুষদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওদের দুজনের রোগা, গাল ভাঙা মুখের উজ্জ্বল হাসিতে দাঁড়িয়ে আছে।

"পশ্চিমের আলো ডাইরেক্ট পড়ে তো, রঙ জ্বলে গেছে"- ঘাড় না ঘুরিয়েই তাপস বলল।

- পঁচিশ বছর কম না কী। রামকৃষ্ণ ফোটোগ্রাফি ল্যামিনেট করে দিয়েছিল- ফ্রীতে-

- তোমার নীরব প্রেমিক ছিল ছেলেটা-

- সে আবার কী কথা-

- ও দেখলেই বোঝা যায়, হা হা- এখনও কেমন লজ্জা পাচ্ছে দেখ -

- হাবিজাবি কথা রেখে স্নানে যাও-

- যাচ্ছি। দেখছিলাম...

- ঝুনিদিদি কী সুন্দর ছিল না তখন? বাচ্চুপিসিও।

- কোভিড না এলে এ ছবির অনেকেই থাকত আজ; কোভিড আর ক্যান্সার - দুই ক'য়ে সব শেষ করে দিল-

- ভবিতব্য। স্নানে যাও এখন-

- সে যাচ্ছি। আজ বিকেলের মধ্যেই ঠিক করে ফ্যালো কোথায় যাবে। কাল অফিস গিয়ে টিকিট কাটতে দেব।

- বলেছি তো কোথায় যাব-

- কোথায়?

- কাশ্মীরে নয়, শিলঙেও নয়...

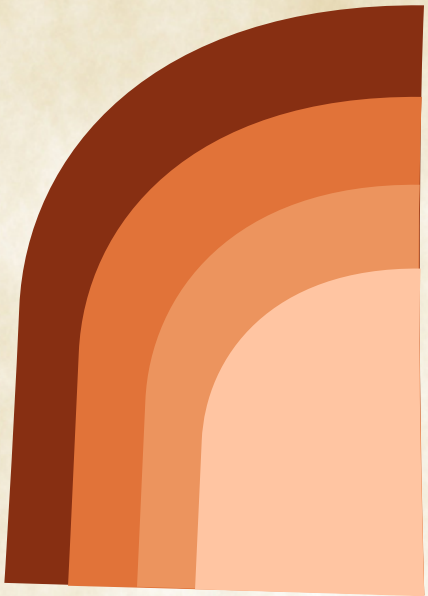

- রাঁচী-ই তবে? তাই তো?
- তোমাকে বললাম না সেদিন, একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি। খুব দূরে নয়। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ধরে -
- হৃদয়পুর?
- আরো দূরে-
- বামনগাছি, দত্তপুকুর, অশোকনগর--এই বললে কাছে!
- এই তো, এসেই গেলাম-
- গোবরডাঙা?
- ঠাকুরনগর, চাঁদপাড়া, বিভূতিভূষণ হল্ট। সেইখানে নামব।
- তারপর?
- একটা ভ্যানরিকশা নিয়ে হাটে যাব। থীম হাট।
- সবেতেই থীম আজকাল। তো, থীমটা কী?
- সেটাই তো মজা। সারপ্রাইজ। এক এক সপ্তাহে এক এক থীম। প্রতি সপ্তাহেই বদলে যায়-
- ঠিক করে কে?
- উদ্যোক্তারা হয়ত। কে উদ্যোক্তা জিজ্ঞেস কোরো না। জানি না।
- আরে বাবা, জিজ্ঞেস করব না। জেনে কী হবে? শারদ সম্মান তো দিতে যাচ্ছি না। কিন্তু তুমি সন্ধান পেলে কী করে? ট্রাভেল ম্যাগাজিন?
- রুমনি বলছিল সেদিন।
- রুমনিরা গিয়েছিল?
- না ওর চেনা কেউ গিয়েছিল। পিসতুতো দাদার শাশুড়ির মামাতো ভাইএর ননদ, ননদাই-
- ধ্যাৎ। ঢপ-
- না না সত্যি। রুমনি বলল তো। সেদিন থীম ছিল, নদী। নৌকো টৌকো-ও বিক্রি হচ্ছিল নাকি।
- কিনেছিল?
- না, বিশাল এক ইলিশ পেয়েছিল। তাই নিয়ে বাড়ি ফিরে যজ্ঞিবাড়ির রান্না একদম। কাছাকাছি যারা থাকে - বন্ধু, আত্মীয় আর কি - সবাইকে ঐ ইলিশের পিস পাঠিয়েছিল। সেই থেকেই তো রুমনি জানল-
- সেদিন গেলেই তো ভালো হত।
- সেদিন তো আর বিয়ের পঁচিশ বছর ছিল না; এ কী, মুখ ব্যাঁকাচ্ছ কেন?
- কেমন একটা ম্যাড়মেড়ে হবে না?
- হোক। পছন্দ না হলে, বাড়ি ফিরে তোমার ইচ্ছে মত শিলং কিম্বা রাঁচির টিকিট কাটব; জানো, একটা অদ্ভুত কথা বলছিল রুমনি। বলছিল, ননদ একটা নদী দেখেছিলেন; নদী, নৌকা এই সব। ননদাই বলছিলেন, উনি এ সব কিছু দেখেন নি, শুধু মাছ দেখেছিলেন, মাছ, মাছের বাজার-
- কোনো মানে হয়! আগাগোড়া ঢপ। পুরো রুমনি স্পেশাল -

২

- কী থীম হবে মনে হয়?
- ভাবি নি।

- ভাবো নি?
-বলতাম না তাহলে? তুমি ভেবেছ না কি?
- সময়ই পাই নি। ভাববে এখন? মানে গেস করবে? সময়টাও কাটবে-
- গেস করার তো কোনো সীমা নেই। যা খুশি হতে পারে। একটা তো কিছু বেসিস লাগে।
- অত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই। একটা খেলার মত। এই দু ঘন্টার বোরিং জার্নি - গেসিং গেম খেললে তাড়াতাড়ি কেটে যাবে - খেলবে?
- খেলার নিয়ম কানুন কী হবে? হার জিত?
- জেতা হারা কিছু নেই। ধরো তুমি একটা থীম গেস করলে, বললে; আমি গেস করব সেই থীমে কী বিক্রি হবে হাটে। তারপর আমি গেস করব থীম, তুমি বলবে, সেই হাটে কী এক্সপেক্ট করো তুমি। তারপর ধরো, আল্টিমেটলি, স্পটে গিয়ে আমরা যদি দেখি কারোর ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড গেস মিলে গেছে - তখন...
- সেই জিতবে।
- আবার হারজিত! আচ্ছা বেশ তাই হবে।
ট্রেনের জানলার বাইরে শীতের রোদ তেজী হচ্ছিল, হাল্কা কুয়াশা কেটে গিয়ে হলুদ কিম্বা গোলাপি বাড়ি, কমলা রোদ, সবজেটে পুকুরে আকাশের রিফ্লেকশন; স্টেশনে যাত্রীর ওঠানামা - ভীড় নেই তেমন। গান শুনিয়ে পয়সা চাইল অন্ধ মানুষ, কামরায় ঝালমুড়িওলা ঘুরে গেল দুবার, পঞ্জিকা বিক্রি হল একটা।
তাপস বলল, "আফ্রিকা।"
- থীম হবে আফ্রিকা! কী রে বাবা!!
- বললাম তো ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড গেস। কী বিক্রি হবে বলো?
- বই বিক্রি হবে - চাঁদের পাহাড়, আউট অফ আফ্রিকা, তারপর ধরো, চিনুয়া আচেবে, নাডিয়ান গর্ডিমার, কোয়েটজীর বই; রানিং দ্য রিফ্ট, তারপর নইপালের কী একটা বই আছে না?
- তুমি তো বইমেলার থীম প্যাভিলিয়ন বানিয়ে দিলে। বইয়ের বাইরে কিছু বলো-
- জীবজন্তুর স্ট্যাচু, মাস্ক, বাওবাবের চারা... আফ্রিকান খাবারের স্টল তো থাকবেই - নাম টাম তো জানি না-
- বাওবাবের চারা টা হেব্বি দিলে- এর বাইরে আর কিছু?
- একটা সাফারি হবে।
- হাটের মধ্যে?
- কী জানি। এবার আমার পালা।
- বেশ বলো।
- বুদ্ধ। মানে বুদ্ধদেব।
- খুব সোজা। ওং মণিপদ্মে হুম লেখা জপযন্ত্র, বুদ্ধের মূর্তি, জাতকের গল্প, তোমার বাওবাবের চারার মত বোধিবৃক্ষের চারা, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে সুজাতার ইস্পেশাল পায়েস-
- কিছু একটা মিস করছি -
- কী?
- কেন জ্যোৎস্না? গৃহত্যাগী জ্যোৎস্না?
- সে কী আর শিশি করে বিক্রি হবে? আরো কী যেন বলছিলাম, হ্যাঁ একটা ছোটো মেডিটেশন সেশন-
- হাটে ওসব হবে?
- বা, সাফারি হতে পারে আর মেডিটেশন হবে না? আমি বলি এবার?

- বলো-
- আ বিগ জিরো। শূন্য। গিয়ে দেখব কিস্যুটি নেই। নো থীম, নো হাট, নো দোকান। ধূ ধূ মাঠ।
- তাই নিয়ে ফিরব-
- কী নিয়ে ফিরব?
- শূন্যতা-
"সে তো.."মুখ নামিয়ে ঝোলা হাতড়ালো তাপস। জলের বোতল বের করে আলগোছে জল ঢাললো গলায়। "তোমার টার্ন" বলে ঘড়ি দেখল।
স্বাতী বলল, "শিশু"। অমনি ঝপ করে স্তব্ধতা নামল কামরায়। তাপস জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

৩

মধ্যাহ্নের রোদ ওদের কাঁধে আলোয়ানের মত জড়ো করা ছিল। স্টেশনে নেমে হাটের কথা বলতেই রিকশা পেয়ে যায়; অল্পবয়সী ছেলে, শিস দিতে দিতে প্যাডল করল সারাপথ, বড় রাস্তায় উঠে কালভার্ট পেরোলো তারপর পেল্লায় মাঠের সামনে কপাল মুছে বলল - "এসে গেছি। গাড়ি আর যাবে না। এখান থেকে হাঁটতে হবে আপনাদের। এই মাঠ পেরোলেই হাট পড়বে বাঁ হাতে।"
হাটের চালা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। স্থানীয় মানুষজনকে মাঠ পেরিয়ে সেদিকেই হাঁটতে দেখছিল ওরা।
- ফেরার পথে রিকশা পাব?
- বলা মুশকিল। বাস পাবেন এখান থেকে - স্টেশন নিয়ে যাবে; কলকাতায় ফিরবেন তো?
- বাস? এখানে দাঁড়াবে? বাস স্টপ কোথায়?
- হাত দেখালেই দাঁড়িয়ে যাবে।
- তুমি আসবে ভাই? এই ধরো ঘন্টা দুই পরে?
- আমার মোবাইল নম্বরটা রেখে দিন। আপনাদের হয়ে গেলে, ফোন করবেন একটা।
- আজ হাটের বিষয় কী? জানো তুমি?
- ঐখানে গেলেই দেখবেন, লেখা আছে। না গেলে জানা যায় না।

কালো বোর্ডে সাদা খড়ি দিয়ে লেখা ছিল "সময়"। তার তলায় নীল রঙে দু'মুখো তীরচিহ্ন। মুখ চাওয়াচায়ি করল ওরা।
- অ্যারোর ডিরেকশন ঠিক বুঝলাম না। কী অর্থ? দুদিকে ই দোকান আছে-সেটা তো অবভিয়াস। এনি ওয়ে, আগে, বাঁদিকে যাব না ডানদিকে?
- একদিকে শুরু করি।
- কী পাওয়া যাবে, এনি গেস?
- ঘড়ি টড়ি? কী জানি কি-
স্বাতী হৈ হৈ করে বলল - ওমা ঐ দেখো কত খেলনা।
- কই?
-সামনের দোকানটায়, দেখছ না? আরে ঐ তো - তালপাতার সেপাই, বাঁশি, ট্যামটেমি, ওমা কী সুন্দর চোখ বোজা পুতুল, আমার ঠিক এরকম একটা ছিল-আরে, এই দেখো দেখো, কত কমিক্স - এই তো অরণ্যদেব, ম্যানড্রেক, বাহাদুর-
- কোথায় দেখছ এসব? রুমনির রোগে ধরল?
- মানে? তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

- না। কোথায় খেলনা? দ্যাখো স্বাতী, কত বড় হাঁস।
- হাঁস! সে আবার কোথায়?
- ঐ তো, রাজহাঁস, আরে, সত্যিকারের নয়, বরফের। দেখতে পাচ্ছ না? ঐ যে - আমার আঙুল বরাবর তাকাও - বিরাট রাজহাঁস- বরফ দিয়ে তৈরি, কেমন গলে গলে পড়ছে - পাশে আর একটা সিমিলার হাঁস তৈরি করছে কারিগর- আরে ঐ তো - আঙুল বরাবর তাকাতে বলছি না?
স্বাতী অবাক হয়ে তাপসের দিকে তাকালো। চশমার নিচে ওর চোখের মণির ধীর নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছিল সে।
-কী বলছ কী তুমি?
এবারে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাপস। তারপর স্বাতীর হাত ধরে টানল "আর এগিও না, আর একটুও এগিও না, এ কোথায় এলাম স্বাতী?" গলা কাঁপছিল তাপসের।
- কেন? কী হল? ক্কী দেখছ তুমি?
- এ তো শ্মশান। ওপাশে নদী। ধূপ বিক্রি হচ্ছে, ফুল, সাদা কাপড়, কাঠ। কোথায় এলাম? এ তো হাট নয়। এখানে কী কিনব আমরা ?
স্বাতী অবাক হয়ে আবার সামনে দেখল। দেখল, পাশাপাশি ঝলমলে সব চালাঘর- খেলনা বিক্রি হচ্ছে ঢেলে - লাট্টু, ঘুড়ি, ভেঁপু, পুতুল, খেলনা গাড়ি, ব্যাটবল। পাশের চালায় ঝুড়িভর্তি গোলাপী মঠ, পাঁপড়ভাজা...
-কী হল তোমার? শরীর খারাপ লাগছে? জল খাবে? রিকশাকে ফোন করে ডেকে নাও। আর এখানে থাকতে হবে না।"
তাপস সামান্য টলছিল। স্বাতী ওকে ধরে নিল - "চলো, একটু বসবে। খাওয়াও হয় নি কতক্ষণ।"
"এখানে বসে খাওয়ার কোনো জায়গা আছে, দাদা? কোল্ড ড্রিংকস পাওয়া যাবে?" স্বাতী খেলনাওলাকে জিগ্যেস করেছিল।
দোকানী আঙুল তুলে দেখাল -"ঐ তো"।

ছাউনি দেওয়া কূয়ো ঘিরে কতিপয় বসবার জায়গা, ওপরে চাঁদোয়া। কপিকল ঘুরিয়ে জল তুলে আনছিল বুড়ো মানুষ।
"কী ঠান্ডা জল", চোখে মুখে জল ছেটালো তাপস, ঘাড়ে, কানের পিছনে ভিজে হাত বুলোলো," আঃ কী আরাম!
-ভালো লাগছে? দোকানবাজার দেখতে পাচ্ছ এখন?
তাপস উত্তর দিল না।
স্বাতী বুড়োমানুষের দিকে এগোলো, ইতস্তত করল, তারপর বলল, "আর এক ঘটি জল তুলে দিন বাবা"। কপিকল ঘুরছিল, স্বাতী তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, ভাবল জিজ্ঞাসা করে, কী দেখছে বুড়োমানুষ। কূয়োর জলে চোখ নিবদ্ধ ছিল বুড়োমানুষের। স্বাতীও জল দেখছিল। হাত নেড়ে তাপসকে ডাকল - "কী গভীর কূয়ো, তলা দেখা যায় না।"
শীতের বিকেলে অবিশ্রান্ত পাতা ঝরছিল - ছাউনির ফাঁক গলে হলুদ পাতা প্রাচীন কূপের অভ্যন্তরে খসে খসে পড়ছে। মাথার ওপরে ঝকঝকে আকাশ আর রোদ, দিন শেষ হতে যেন অনেক বাকি - হাতে যেন অগাধ সময়; এই সব সময়ে ঝরা পাতার সম্পূর্ণ গতিপথ নিরীক্ষণ করার কৌতূহল জাগে। ইঁদারার দেওয়ালে কালচে সবুজ শ্যাওলা- ভেলভেটের মত; চটে যাওয়া পলেস্তারা, এবড়োখেবড়ো ইঁট কারুকার্য ফর্ম করেছে - যাকে ব্যাকড্রপে রাখলে খসে পড়া পাতাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না; বিভ্রম ঘটে তখন - পড়ন্ত পাতাকে স্থবির মনে হয়, পরক্ষণেই শ্যাওলাকে পাতার মত লাগে, তারপর নিম্নগতি পাতাকে আবার ঠাহর করতে গেলে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সে কুয়োর তলদেশ স্পর্শ করে গেছে ততক্ষণে। পাতা পড়তে থাকে, আরও পাতা, অজস্র পাতা, তাদের গতিপথ সম্পূর্ণ গোচরের আগেই আবার যাবতীয় বিভ্রম ঘটতে থাকে।
বিকেলের রোদে, গাছের ডালে পাখি এসে বসে, উড়ে যায়, ফিরে আসে। এক পাখি। অন্য পাখি। পাখিরা।
ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই সব পাতা ঝরা দেখছিল।

মনতারা

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারে দুধ জমানো অনন্ত ধানক্ষেতে
দাঁড়িয়েছিলাম এসে, তুমি বলছ চলে যেতে

আমার সারা গায়ে এখন পাখপাখালির ডাক
সূর্য পাটে গেলে পরে উঠবে বেজে শাঁখ

আওয়াজে তার কীটপতঙ্গ সবাই উল্লসিত
জ্বলতে জ্বলতে প্রদীপ যদি একটু আলো দিত

মেখে নিতাম মাথায় তবে, মাখিয়ে দিতাম ঠোঁটে
হাট বসবার সময় কত মানুষ এসে জোটে

হাট ভাঙবার পরেও জানো, নিত্য তাদের দেখি
ওই যে একাকীত্ব সেই তো সবচেয়ে বড় মেকি

কোথায় একা, কেন একা, কীসের অবিশ্বাসে?
ভালবাসার সিন্নি, সময় মাখুক না সন্ত্রাসে

তার ভিতরে আছে জেগে, বাতাসা আর কলা
শব্দ যখন পাচ্ছি তখন পাবই তোমার গলা

তোমার আঙুল নিয়ে একটা ছোট্ট গল্প বলি
সত্যযুগের সত্যি সেটা, যদিও আজ কলি

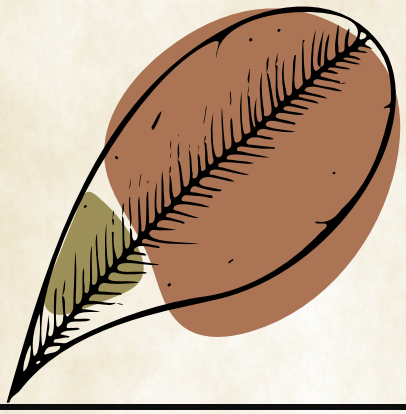

তবু ভাল লাগবে তুমি মন না দিয়ে শুনো
গরাদে কী আপত্তি, যে স্বভাবে ঘরকুনো?

বাড়ি বাঁধার স্বপ্নে সে ফের লোককথায় ঢুকে
সোনার নূপুর রূপোর পায়ে বেঁধেছে ভুলচুকে

বাঁধতে বাঁধতে কখন নিজে পড়ে গেছে বাঁধা
পুরনো এক প্রেমের গল্পে এল নতুন ধাঁধা

রানী বলেন, “রাজত্ব কই?” মন্ত্রী বলেন, “সেনা’?
রাজা বলেন, “প্রেমিক হলে, প্রেমেই যাবে চেনা!”

অমান্য কে করতে পারে? আদেশানুসারে
জন্ম নিল একটি দেওয়াল আলতো অহংকারে

অবাস্তব আর বাস্তবে তার পথ গিয়েছে বেঁকে
নিজের গায়ে নিজেই সাতটি ছিদ্র নিল এঁকে

ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সাতটি অনামিকা
না, আর কোনও টিপ্পনী নেই, নেই তো কোনও টিকা

মুখ দেখে নয়, চোখ দেখে নয়, চেনো আঙুল দেখে
তবেই সানাই বাজবে বন্ধু, তোমার অভিষেকে
কেমন করে চিনবে, প্রেমিক নিতান্ত বিহবল
ঘটিতে সাত সাগর এবার কোনটা যে কার জল

কাম চিনলাম, ক্রোধ চিনলাম, চিনেছি লোভ, মোহ
মাৎসর্যের ভিতরে মদ, কে করবে বিদ্রোহ?

প্রেম সে কোথায়, কোন আঙুলে, কী তার অভিজ্ঞান
বন্ধ চোখের দরজা খুলে জন্ম নিল ধ্যান

অনন্ত বৈভবের ভিতর কে উত্তিষ্ঠত
এই পৃথিবীর ক্ষত এবং এই প্রকৃতির ক্ষত

রিপু মরার পরে প্রেমই রাখল ধরে তাকে
ওষুধে শুশ্রূষা কোথায়, শুশ্রূষা মৌচাকে

তাই তো ঋষি বলেন, মধু বাতাঃ ঋতায়তে
ভিখারিনীর সঙ্গে দেখো ভিক্ষুকও রাজপথে

গৃহস্থ আজ আঁকেনি কই আলপনা চৌকাঠে
ঘরে ঢোকা বারণ সবার, লক্ষ্মীও তাই হাঁটে

হারিয়ে গেছে সবার পেশা, আছে বাঁচার নেশা
সকালবেলা জপ করেছি, সন্ধ্যারাতে এষা

রাতে খাবার না পেলে পর মৃত্যু রেঁধে খাব
আসুক না দুর্ভিক্ষ, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব

প্রাচীন কোনও জনপদের নতুন কোনও জটায়
আঁধার যখন মাতৃগর্ভে হচ্ছে আলোর ছটা

পাঁচজন পল্লবই তবু মুখ লুকোচ্ছে ঘটে
অনন্ত সঙ্কট থেকে ফের অনন্ত সঙ্কটে

পাক-খাওয়া প্রাণ একখানা গান গায় কোনও সঙ্কেতে
থাকতে বলবে কাছে নাকি বলবে চলে যেতে?

গৃহস্থ আজ আঁকেনি কই আলপনা চৌকাঠে
ঘরে ঢোকা বারণ সবার, লক্ষ্মীও তাই হাঁটে

হারিয়ে গেছে সবার পেশা, আছে বাঁচার নেশা
সকালবেলা জপ করেছি, সন্ধ্যারাতে এষা

রাতে খাবার না পেলে পর মৃত্যু রেঁধে খাব
আসুক না দুর্ভিক্ষ, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব

প্রাচীন কোনও জনপদের নতুন কোনও জটায়
আঁধার যখন মাতৃগর্ভে হচ্ছে আলোর ছটা

পাঁচজন পল্লবই তবু মুখ লুকোচ্ছে ঘটে
অনন্ত সঙ্কট থেকে ফের অনন্ত সঙ্কটে

পাক-খাওয়া প্রাণ একখানা গান গায় কোনও সঙ্কেতে
থাকতে বলবে কাছে নাকি বলবে চলে যেতে?

টিপ

সঞ্জয় চক্রবর্তী

আলতোকপাল, তোমার সাথে ভাব হয়েছে টিপের।
নীলের বুকে সূয্যি, কিম্বা সমুদ্রেতে দ্বীপের
ভাব হয়ে যায় যেমন করে। বুঝবে কি আর বোকায়?
বুঝলে সে'ও জড়িয়ে যেত ছড়িয়ে পড়া খোঁপায়।

লালপানা টিপ, আজকে তোমায় অনামিকাই বোঝে,
ললাটে তার ভাগ্য লেখা, ঈষৎ সংকোচে
ছুঁইয়ে গিয়ে দেখছে তুমি যথাস্থানেই কি না?
আর বোকা মন, সান্তনা পায়, তোমাকে পাচ্ছে না ...

আগুনে কিন্তু খুব জ্বলবে ঈর্ষা চিতায় যারা,
কাচালিতে কূট মেশাবে প্রাচীনপন্থিরা।
দু'ফোঁটা বিষ এক সমুদ্রে, কি আসে যায় তাতে?
জানিয়ে যাবে দু'চারটে চুল টিপেরই সাক্ষাতে।

আলতো কাঁটায় বিঁধছো যখন আলগা হওয়া খোঁপা,
জানলে না টিপ তোমার কাঁটায় বিঁধছে তোমার বোকা।

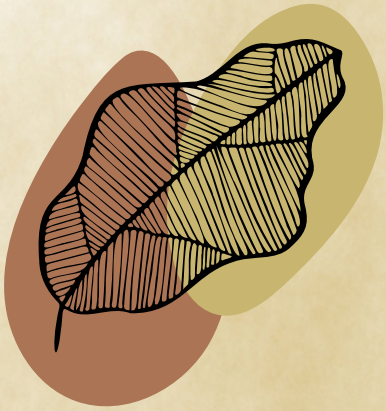

রভস

অমর্ত্য দত্ত

এই তো রতিকথা। স্পর্শে শিহরন-ও।
কাহিনী নেমে গ্যালো গভীরে ত্রিযামাতে।
কে তুমি ইছামতি মেলেছো অপঘন?
ছড়াবো বীজধান। তোমার ভিজেমাটি...

আহা কি মাধুকী গন্ধ সুহানার!
আর্যা-ছন্দসী করেছে বিহ্বল
এবং প্রাকৃতে উপমা নেই তার,
কখনো কাদাকাদা। কখনো জলে জল।

কখনো তীব্র। প্রমোদচঞ্চলা...
কখনো সুখবনে শান্ত হরিণা।
কখনো তুলে ধরে রঙিন আদিকলা
অতলে টেনে নেয়, জানিনা পরিণাম...

জানিনা পরিণাম। শুধুই অনুভূতি...
এই তো ঠোঁটে ঠোঁট। এই তো শুরুয়াত্।
কাহিনী নেমে গেলে গভীরে, ইছামতি--
রভস কথা বলে। রভস। সারারাত...

নিষ্প্রয়োজন

শাহানা চৌধুরী

কাউকে লাগবে না,
অক্ষরের প্রতিটা পাতায় আমি খোদাই করে লিখে দেব,
'আমার কাউকে লাগবে না।'

যতটুকু আকাশ আমার দৃষ্টিতে থাকে,
যতটুকু সমুদ্র আমার সীমানায় বয়ে যায়,
যতটুকু রাত নিদ্রায় অনিদ্রায় ছেয়ে থাকে,
পুরোটুকুর মধ্যে আমার একার উপস্থিতি অনির্বাণ,
আমার কাউকে লাগবে না।

কার হাহাকার লেগে থাকে স্বপ্ন জুড়ে?
বোকার মতো কাকে আমি ছুঁতে চাই?
সব মরীচিকা, সব ধুলো ছাই,
আমার কাউকে লাগবে না।

অভ্যেসটা আস্তে আস্তে স্থির হবে,
পুরনো দিনপঞ্জি চুকিয়ে দিয়ে নতুন ফর্দ খুলবো,
সকালটাকে সাজাবো একান্ত নিজেকে ভালোবেসে,
বললাম তো আমার কাউকে লাগবে না।

টিকটিকির মতো নখের আঁচড়ে আঁকড়ে ধরবো যন্ত্রনা,
বিষাক্ত সাপের ছোবলে আমি হাসতে হাসতেই সাধ্ নেবো অতীতের,
হালকা হব, বেলা শেষে গুনে পাওয়া অর্থ পকেটে ভরে,
নিঝুম রাতে ট্রেনে ওঠার অপেক্ষায় আমি ক্লান্ত হবো না,
কারণ আমার কাউকে লাগবে না।

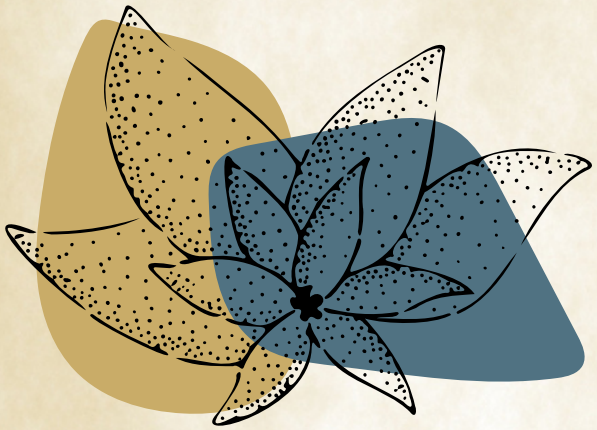

এবেলা শরীরটা ক্লান্ত না হলে,
ও'বেলায় শরীরটাকে চুকিয়ে দেবো তার ঋণ,

মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা গুলো ঝেড়ে ফেলব গল্পের মত,
একা থাকার প্রবণতায় আমি বেলা শেষের পথিক,

আমার দারুন জ্বর হয়, মাথা দপ দপ করে,
মেরুদন্ডের চিনচিন ব্যথায় আমি কাঁপতে থাকি থর থর করে
তবু আমার কাউকে লাগবে না।

আমি বেলা শেষে নিজের আয়নায় নিজেকে দেখতে চাই,
আমি আমার মত থাকতে চাই।
আমার প্রস্ফুটিত বকুল গুলো ঝরে পড়ুক, শুকিয়ে মুর্ছে যাক,
তবুও আমার আমিটা আমার হয়ে থাক।
আমার কাউকেই লাগবে না।

তোমার নাম

পায়েল দত্ত

আজ জল থৈ থৈ মন
এ কালবৈশাখী অচেনা পথে
ঠিকানা হারিয়ে যখন
তোমার নামটি লিখে রাখে

আমার লিখতে চাওয়া কবিতায়
মেঘ খসে পড়ে অবিরাম
বাতাস যখন গুজব ছড়ায়
অন্তমিলে তোমাকে পেলাম

উচ্ছন্নে যাওয়ার এ উল্লাসে
বৃষ্টি মেখে সারা গায়ে
আমরা দুজন বেহিসাবি হলে
বলো বন্ধুদের কি দায়

আজ জল থৈ থৈ মন
তোমার পাড়ার কাছে
একটা কালবৈশাখী দিন
হঠাৎই থমকে আছে.....

বাব্‌ল

অসীম দাস

ডবল ডোজ নিলেই এই বাব্‌ল থেকে বেরোতে পারবো,
এতদিনের দা্গ দেওয়া গণ্ডি পেরিয়ে স্বাধীন হতে পারবো,
পারবো আবার হাতে হাত মেলাতে, বিজয়ার কোলাকুলি করতে,
উড়োজাহাজে উড়তে পারবো,
হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারবো যা কিছু হাতের বাইরে।

এমনটাই তো বুঝেছিলাম লকডাউনের সময়।
ভেবেছিলাম এই বাব্‌ল থেকে বেরোতে পারলে,
শেষ হাতছানিটাকেও হয়ত আটকে রাখতে পারবো।

বুঝিনি যে এটা শুধু একটা বাবল ছেড়ে আর একটা বাব্‌লে ঢোকা।

যে বাব্‌লে জন্ম সেই বাব্‌ল থেকে সহজে বেরিয়ে যাওয়া যায় না।
ছেলেবেলায় পাশের বস্তিতে যে বাব্‌ল রোজ দেখতে পেতাম সেটা হয়ত
আজও একই রকম আছে।
ওই বাব্‌লের বাসিন্দারা আজও হয়ত রাস্তায় অটো চালায় আর তাদের
বউরা বাবুদের বাড়িতে কাজ করে।
লকডাউন তাদের ঘরে ধরে রাখতে পারেনা। কারণ তাদের খাবার
অনলাইনে অর্ডার করা যায়না।

আফগানিস্তান বা ইউক্রেনে কেউ কি আর কোভিডের খবর রাখে?
ওরা যে আজ অন্য বাব্‌লে বন্দি !!

সওগাত্

অমর্ত্য দত্ত

অপূর্ব বলো, আমি তাকে ছেড়ে আসবো কি ভাবে?
এই চৌকাঠ পেরোলেই শূন্যতা শুরু হবে জানি।
তবু বলতে পারিনি তাকে, দাও স্থান। করো আশ্রিত ।
সে কি বুঝবেনা কাঙ্খা আমার? বলবে না থেকে যেতে পারো ।

এই এত ধনধান্য কেন সে ছড়িয়ে ছিলো তবে?
বলেছিলো দ্যাখো দ্যাখো --- এই হলো মরকতমণি।
কারো স্তব্ধ দু'চোখ যদি এক ছোঁয়াতেই হয় আলোকিত,
সে চাইবে না অপূর্ব, দাও প্রেম। আলো দাও আরও...

এ'তো কোনো অপরাধ নয়। দোষ নয়। ভিক্ষাজীবন...
অপূর্ব বলো, তার দান ছাড়া কি হবে আমার?
সে কি বোঝেনা বিবর্ণতা কতটা গভীর হতে পারে?
চৌকাঠ পেরোলেই রসাতলে টেনে নিয়ে যাবে।

শুধু চেয়েছি কয়েক কণা আলো তার কাছে। স্পন্দন।
যদি সে কোনোদিনও মুখ ফুটে বলে একটিবার -
থেকে যাও। এই নাও সওগাত্ যা চেয়েছিলে এতদিন ধরে।
অপূর্ব বলো, আমি তাকে ছেড়ে আসবো কি ভাবে?

অমরত্বের প্রত্যাশা নেই

সৌমিক ঘোষ

আমার কবিতা যতটা পড়েছো
ভয় গাঁথা ছিল ক্ষতে
আমার আখরে চিতা আগুনেরা
রাখা ছিল জল হাতে

আমার অশ্রু যতটা ঘেঁটেছো
পুরোটাই চোরা বালি
আমিই ছিলাম তোমার কায়ায়
আত্মার জোড়াতালি

বছর ঘুরেছে যে চেনা সড়কে
তার পাশে বুড়ো গাছে
সকাল ও সন্ধ্যা ঝরা পাতা এসে
কবিতা শুনিয়ে গেছে

অক্ষর গাছে আপেল খুঁজেছে
চিরকাল নর-নারী
আমার পদ্যে খুঁজে নিও তুমি
শব্দের ভাড়াবাড়ি।

নির্বাসনের কথন

তপনজ্যোতি মিত্র

কবি গেছেন নির্বাসনে
সমস্ত অহংকার মাটিতে নামিয়ে রেখে শুধু বিষাদচেতনার মেঘ সঙ্গী করে
চলে গেছেন অরণ্যে ঘেরা এক রূপপাহাড়ি দেশে

রাজাও গেছেন নির্বাসনে
তরবারি মাটিতে নামিয়ে রেখে
সমস্ত রাজকীয় মহিমা পেছনে ফেলে রেখে
চলে গেছেন তিনি
অশ্রুতমা নদীর ধারে রূপকথাময় সেই পাহাড়ি দেশে

বিষাদমগ্ন পৃথিবীর করুণ নদীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন সর্বস্বান্ত রাজা
ভাবছিলেন - তাঁর মত দীন ও দরিদ্র আর কে আছে?

দিগন্তপারের সীমারেখা পেরিয়ে তখন কেউ হেঁটে আসছিল
তার মলিন বসন, সারা শরীর ধূলিতে ধূসর, চোখ বেদনার্ত

রাজার সঙ্গে দেখা হলো কবির।

রাজা ডাক দিলেন কবিকে,
কবি কাছে এলে, রাজা দেখলেন কবির দুই হাত শূন্য
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন - কোথায় তোমার কবিতার খাতা কবি?

আমাকে শোনাও কোন দীনতম কুটিরের কবিতা,
কোন ম্লানতম রাত্রির নক্ষত্রময় আকাশের কবিতা,
অনন্ত যাত্রার পথে চলে যাওয়া নিঃসঙ্গ পথিকের কবিতা।

হাহাকারের মেঘ পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছিল মৌসুমী পাখিরা।

কবি সেই পাখিময় দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ,
তারপর মৃদু স্বরে বললেন - হারিয়ে গেছে তারা।

কারা হারিয়ে যায়, কোন শব্দমালা, কোন গ্রন্থাবলী, কোন রূপভাস ?

কবি থরথর করে কাঁপছিলেন -
কোথায় কারা পুড়িয়ে দিয়েছে তাঁর কবিতার খাতাগুলো,
তাঁর সারা জীবনের সম্পদ।

বিষণ্ণতম গোধূলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে দুই দীনতম মানুষ,
তারা পেছন ফেলে এসেছে সব সম্পদ।

তাদের জন্যে শুধু জেগে থাকছিল -
প্রকৃতি, প্রকৃতির বন্ধুরা - মৃদুস্রোতা নদী, গহন বনভূমি, বেদনার নীল পর্বতমালা,
দিগন্তজোড়া নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঝরে যাওয়া শুধু এক শীর্ণ ঝর্ণার ধ্বনি ।

গাছ থেকে খসে পড়ছিল একটি দুটি পাতা, আকাশ থেকে দু'একটি তারা,
সেইগুলো হয়ে যাচ্ছিল কবিতার এক একটি শব্দ, অনুভূতিমালা।

কবি শোনাচ্ছিলেন রাজাকে কবিতা -

'যদি জেগে থাকি এই বিষণ্ণ সুন্দরের কাছে
যদি কোথাও কোনো কান্নার ধ্বনি জেগে আছে

অনন্তের দিকে চলে গেছে যে জীবন
সেই সাগরের উপকূলে মন ভুবন

সব স্বপ্ন মিলে আছে করুণ ভালোবাসার গহন অতলে
দীনতার ঘর পেরিয়ে সেই রূপতমা নদীজলে

রাজার চোখ থেকে নীরব অশ্রুপতন হচ্ছিল
বহুদিন পর রাজা এত শুদ্ধ কাঁদছিলেন

সে বড় এক মায়াবী পৃথিবী,
মায়াবী পৃথিবীর সেই কান্নার প্লাবন দুখী মানুষের কবিতাগুচ্ছ হয়ে থাকছিল।

অসীম উদাসের কাছে

তপনজ্যোতি মিত্র

তবু থেকো নীলাঞ্জনের অবাক বিস্ময়ে!

ভালোবাসা ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে একটি বর্ণময় দিন -
তোমাকে সাক্ষী রেখে মায়াবী পৃথিবী।

অনন্ত সমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি তৃষ্ণার্ত মানুষ

তার পা ছুঁয়ে আছে বালিকণা

সমুদ্রের হাজারো ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে তীরে

তাকে বলে গেছে -
আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকবো
তুমিও থেকো

এই দিগন্ত বিস্তৃত অসীম উদাসের কাছে দাঁড়িয়ে
কি তার চোখ ভিজে উঠেছে জলে?

কেউ কি জানল?

কেউ কি দেখল?

প্লাবন কি এল?

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি মৃত তবু দ্যাখো আমি বেঁচে আছি
আমাকে নিও না শ্মশানের কাছাকাছি
দাঁতে-ঠোঁটে-জিভে দিও না আগুন ছোঁয়া
এখনও আমার সবটাই স্মৃতি ধোয়া

ডুবে যাওয়া কোনও পাথরের চেয়ে ভারী
যে বৃষ্টি আমি স্মরণ করতে পারি
বর্ণমালায় এসেছে সে অক্লেশে
মদের বিন্দু যেভাবে বরফে মেশে

মাটির ভিতরে মিশে যেতে চায় ঘাস
প্রচারের গায়ে লেগে থাকে ইতিহাস
সে কি ফিউশন, না, নিছক অনুবাদ,
কিনারার থেকে সরিয়ে নিয়েছে খাদ...

পায়ের পাতায় রেখেছে মাথার খুলি
ট্রিগারের থেকে ছিটকে গিয়েছে গুলি
এবড়োখেবড়ো গলির ভিতর দিয়ে
দৌড়চ্ছে কে, আহতকে বুকে নিয়ে?

তার দৃষ্টির থেকে রক্তের ছিটে
উদ্বাস্তুকে চেনাবে নিজের ভিটে
দুঃস্বপ্নকে তুড়ি মেরে ফুৎকারে
যারা শেষাবধি জড়িয়ে রাখতে পারে

যাদের কেবল একটা তত্ত্বে ভয়,
শূন্যতা কোনও শব্দমাত্র নয়
পরোয়া না করে বস্তুবাদের দ্বন্দ
যারা পেয়েছিল হাসনুহানার গন্ধ

আপনজনের স্নান করে ওঠা চুলে
তাদের কথা তো পড়ায় না ইস্কুলে
তাদের চোখের আধো-নির্মিত ডানা
ভেঙেছে আইন, দেয়নি তো জরিমানা

তাদের আত্মার পাগলিনী প্রায় জ্বালা
রজনীগন্ধা ছাড়াই গেঁথেছে মালা;
আমার এই মুখ শুধু সে মালার সুতো
এযাবৎকাল হৃদয়ে যা অনুভূত

কেবল তাকেই আলো করে দিতে পারে
সিনেমাহলের ঘনঘোর আন্ধারে...
দৃশ্যের পরে যেখানে দৃশ্য আরও
জীবনানন্দে মৃত্যুতে থরোথরো
'দৈনন্দিন' নাম নিয়ে প্রত্যেকে
সেখানে নামছে উপরের ঢল থেকে
জলস্রোতকে শরীরে বাঁধছে কাদা
চটের থলিতে কাঁচকলা আর আদা
রেখে দিয়ে সব শত্রুতা মুলতুবি
পেরিয়ে আসছে হাজারও নৌকাডুবি
হাসতে হাসতে দেখছে দুর্নিরীক্ষ্যে
কখনও নিচ্ছে, কখনও দিচ্ছে ভিক্ষে

পাথর ছুঁইয়ে লোহাকে করছে সোনা
গুঁড়িয়ে যাবার সকল সম্ভাবনা
গুঁড়িয়ে দিচ্ছে একেবারে অনায়াসে
ভাঙাচোরা সব নিশ্বাসে নিশ্বাসে...

ঝলসানো মেঘে বন্ধক দিয়ে মন
অবিশ্রান্ত ধারায় সমর্পণ
করছে, নিজেকে ছাপিয়ে খুঁজছে সত্যি
প্রলয়ঙ্করী, প্রলয়ের একরত্তি

দেবে কি আমাকে, বানাতাম স্মৃতিস্তম্ভ
শুধু কান্নার নাম রাখতাম, দম্ভ;
দিগন্তজোড়া বিষম বিপদপাতে
তারার দু'চোখ জ্বেলেছি তো সাক্ষাতে...

হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি
সব সংসারে নিয়ত সম্ভবামি;
নির্জন প্রান্তরে, গাত্রোত্থানে,
জ্যোৎস্নার দুধ ছুঁয়েছি সোনালি ধানে

উল্লাস আর আর্তনাদের মাঝে
কত মানুষের কন্ঠস্বর বাজে
কত কথা এসে দাবি করে যায়, 'সুর দে'
কত বিভীষিকা নিজেই নিজের ঊর্ধ্বে

উঠবার পথে লজ্জায় গেছে টলে
শ্বেতপদ্মকে ডেকেছে, শিউলি বলে
আমি জানি তুমি সে ডাকে দিয়েছ সাড়া
তোমার দু'ঠোঁটে হাজারও একটা পাড়া...

পাড়ার ভিতরে লেলিহান এক দেশ
বাতাসে চেয়েছে ভিজবার সন্দেশ;
আমাকে চেয়েছে মধ্যবর্তী ঘর
প্রতিটি ঘুমের ভিতরে সে কোজাগর

সব জাগরণে ক্ষতবিক্ষত তাও
গাঙুরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি নাও
সবকটা ঢেউ অজ্ঞাতকুলশীল
পরোয়া করিনি, মানতের সেই ঢিল

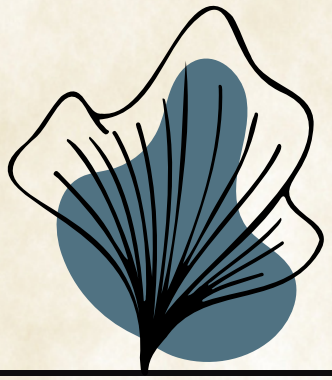

বেঁধেছি, ছিঁড়েছি অজস্র নাগপাশ
ভালোবেসে ফিরি করেছি অবিশ্বাস
অস্তিত্বকে করলাম এলোকেশী
চিৎকার যত, যন্ত্রণা তার বেশি...

আমি নগন্য, সবকিছু থেকে কম
বিমানে উঠতে দিচ্ছে না দমদম;
হাওড়ায় নেই আমার জন্য ট্রেন
অবকাশ পেলে, আমাকেও শুনবেন...

যেরকম আমি আপনাকে রোজ শুনি
পতঙ্গ জানে পাখি কতবড় খুনি;
আমি তো জেনেছি, নেই লক্ষণরেখা
যা শিখেছি সব স্পন্দন থেকে শেখা

সেই নরকের আলো, সেই অজ্ঞতা
দেয়নি মাথায়, ছাদের নিশ্চয়তা
নেই বর্ষাতি, নেই মহেন্দ্র দত্ত
পদ্মবনে কি শুধু হাতিরাই মত্ত?

বিজন সেতুতে, বরানগরের খালে
আমাকে বদলে দিলেন তো কঙ্কালে
আমি তবু সারা শরীরে সাপটে ঘাম
আবার আমার পৃথিবীতে ফিরলাম

তখন সন্ধে, বাস-ট্যাক্সির ভিড়ে
না, আমার দিকে কেউ তাকায়নি ফিরে;
আমি তাকিয়েছি, শুধু বৃষ্টির দিকে
চ্যালেঞ্জ করেছি, সঞ্জয় গান্ধীকে।

কথকঠাকুর প্রলাপ

পারিজাত ব্যানার্জী

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। আব্দূল দাওয়ায় মাদুরখানি বিছিয়ে দেয়। এবারই সবাই আসবে। সৌমেন, মুস্তাক, নিখিল, অরিন্দম — সব্বাই! আর আসবেন কথকঠাকুর। গত পূর্ণিমায় যখন এসেছিলেন, তখনই ছেলেপিলেগুলোকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, “আসচে অমাবস্যায় আবার দেখা হবে— কেমন?”

আব্দূল হাঁ করে বসে সন্ধ্যা হওয়া দেখে। কথকঠাকুর যা বলেন, তাই করেন। কখনও অন্যথা হয়না ওঁনার কথার। তিনি একবার যখন কথা দিয়েছেন, তখন না আসার জো নেই আর। সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছে সে, গাঁয়ের এই অনাথ কচিকাঁচাদের জন্য কি পরিশ্রমটাই না করে চলেছেন কথকঠাকুর। আব্দুলের মতো বাচ্চাদের এনে এই আশ্রয়ে ঠাঁই দেওয়া, তাদের সুবিধা অসুবিধার খেয়াল রাখা, শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বাল্যবিধবা সরলামাসিকে তাদের অভিভাবিকা করে তোলা, অসুধপত্র, পড়াশোনা জামাকাপড়ের খরচাপাতি— “আজব নিকেতন”এর সবই হয় কথকঠাকুরের কৃপাতেই। অথচ কখনও উনি থাকেননা এই গ্রামে। পরিযায়ী পাখির মতো হুট করে আসেন, গল্পে হুল্লোড়ে মেতে থাকেন তাদের সাথে দু একঘণ্টা — তারপরই হুড়মুড় করে উঠে পড়েন, মিলিয়ে যান ধীরে ধীরে অন্ধকারে। কি তাঁর পরিচয়, কি তাঁর ধর্ম, কোথায় তাঁর বাস— সরলামাসিরও জানা নেই কিছু। “উনি দেবতা। ব্রাহ্মণ ঘরের এই বেধবা থেকে শুরু করে মোছলমানের পোলা — সবার কাছে ওঁনার ওই একটাই পরিচয় তাই— কথকঠাকুর। উনি এই আজব নিকেতনের সব — অথচ এমন ভাবটি করেন — যেন কেউই নন। ওঁনাকে বোঝার চেষ্টা করবিনি আব্দূল— শুধু পেন্নাম করবি— পেন্নাম!”

খেলার মাঠের দিকে হট্টগোল শুরু হতেই ভাবনায় বাধা পরে আব্দূলের। ওই এলেন কথকঠাকুর। নিপাট সাদা পাজামা পাঞ্জাবী গায়ে, চোখে পাতলা ফ্রেমের কালো চশমা, কাঁধে একখানি ঝোলায় ভর্তি নানান দরকারী অদরকারী জিনিসপত্র — সরলামাসির হাঁপের ওষুধ, আব্দূলের রোদচশমা, নিখিলের জন্য কলেজ স্ট্রিট থেকে কেনা ইংরেজী বই, মুস্তাকের ফুটবল, অরিন্দমের একসেট পুজোয় পরার ধূতি পাঞ্জাবী, সৌমেনের হাতঘড়ি — সবই আছে ওখানে। আব্দূল জানে, কারণ গেল বারে এসবেরই চাহিদাপত্র ছিল তাদের সবার। রোদে পুড়ে যাওয়া ফর্সা দোহারা মানুষটি যেন ঠিক এক রয়ে গেছেন — বিশেষ কিছুই তেমন পরিবর্তন হয়নি তাঁর — হয়ওনা, অন্তত আব্দূলের জন্ম ইস্তক তো নয়ই।

দাওয়ায় কথকঠাকুর ঠেস দিয়ে বসে একগাল হাসেন — “আজ বুঝি সবার পড়াশোনায় ইতি টানা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ! কি সরলা, তোমার 'সরলতা' র সুযোগ নিচ্ছে তো পুঁচকেগুলো!”

সরলামাসি রোজকার মতো গড় হয়ে প্রণাম করে কথকঠাকুরের হাত থেকে ঝোলাখানা নেয়। মাথা নিচু করেই বলে, “কি আর বলব, ওদের সব্বাইকেই তো আপনি মানুষ করচেন — ওদের থেকে ঠকবার তাই ভাবনা নেই আমার। আজ আসবেন কথা দেয়ে গেছলেন — তাই বইপত্র এবেলা শিকেয় তো তুলবেই ওরা! তার উপর আপনি বলে গেচেন, কোন এক 'তেনাদের' গল্প ফাঁদবেন, ওইসব ইস্কুলের পড়া কি মাথায় ঢোকে তারপর!”

সৌমেন নিখিল একসুরে বলে ওঠে, “হ্যাঁ ঠাকুর, আজ ওইটেই হোক!”

আব্দূল কথকঠাকুরের সবচেয়ে সামনে এসে বসে। সে যেহেতু কথা বলতে পারেনা — সব কেমন মুখে জড়িয়ে যায় — এই আজব নিকেতনের সবচেয়ে বেশী ভালবাসাও তাই হয়তো কোথাও গিয়ে সেই-ই কুড়োয়। বাকিরাও আপত্তি করেনা, ঠাকুর যে বলেছেন, “আব্দূলকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন কেন জানিস — তাঁর নিজের নিখাদ ভালোটাকে তোদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন বলে! ওকে অবহেলা করিসনা কখনও — তাহলে যে সবচেয়ে খারাপ ওঁনার লাগবে!”

আব্দূল একগাল হেসে মাথা নাড়তে থাকে। কথকঠাকুর ওর মুখ থেকে গড়িয়ে পরা লালা পরম যত্নে মুছে দেন। “বেশ তো, গল্পও হবে, 'তেনারা' আসবেন কিনা জানিনা সরলা, তবে আমি নিশ্চিৎ, ভূত নিশ্চয়ই একদুটো আনতে পারব এই আসরে। তবে তার আগে যে এককাপ চায়ের বড় প্রয়োজন! ওই থলেতে হরিহরের দোকানের সদ্যভাজা সিঙারাও আছে। সবার চা না হোক— টা’ টা তো চাই! কি আব্দূল মিয়াঁ— আপনার কি বক্তব্য?”

জোড় হাত করে আব্দূল। ওই যে সরলামাসি বলেনা, “পেন্নাম!” তাই আর কি!

দিনের আলোর সবটুকু নিঃশেষিত এখন। সরলামাসি দাওয়ায় হারিকেন রেখে রাতের রান্নার তরিবৎ করতে চলে গেছে ইতিমধ্যেই। এ গাঁয়ে কারেণ্ট এসেছে ঠিকই, তবে লোডশেডিং এর প্রকোপে প্রায়ই রাতের দিকে আলো জ্বলেনা। আব্দূলদের এসবে অভ্যাস আছে। তাছাড়াও, এমন আলোআঁধারি ছাড়া যে কথকঠাকুরের গল্পও বড় একটা জমেনা!

বেশ জুৎ করেই দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছেন কথকঠাকুর। মুখের হাবভাবে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছেনা, আজ কি গল্প ফাঁদবেন তিনি। প্রত্যন্ত আফ্রিকার কালোজাদু, নাকি ইউরোপের ভূতপুতুল!

আব্দুলের মনের কথাটাই যেন পড়ে ফেললেন কথকঠাকুর। হাসলেন তাঁর সেই ভুবনভোলানো হাসি, "নারে, আজ বড় নিজের ছেলেবেলাটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন যাওয়া হয়না বলতো! ”

অরিন্দম স্বগতোক্তি করে বসল হাঁটুদুটো মুখের কাছে এনে। “ছেলেবেলায় কি আর যাওয়া যায়! আমরা এখনো ছোট, তবু সেই আমরাও কি আর যেতে পারি? চাইলেই পেতে পারি সেই আমবাগানের লুকোচুরি, দাদাদের সাথের হুজ্জতি! একটা বন্যা — একটা বন্যাই সব কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট, তাই না ঠাকুর!”
কথকঠাকুর উত্তর করলেননা। খানিক চোখ বুঁজে রইলেন। আব্দুল জানে, এ সব প্রশ্নের উত্তর হয়না। প্রগাঢ় নিস্তব্ধতাই বয়ে চলে সেখানে, কুলকিনারা মেলে না কিছুতেই। অরিন্দমও অবশ্য উত্তরের খোঁজে না, প্রশ্নের দাবীতেই তা জিজ্ঞেস করে ফেলে অবুঝের মতো মাঝেসাঝে।

হঠাৎ চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলতে শুরু করেন ঠাকুর। “সে তখন খুব ছোট আমি। বছর পাঁচছয় বয়স। তোদের মতো হাফ বা ফুল, কোনোরকম প্যান্ট পরারই চল ছিলনা তখন। ওইটুকু বয়স থেকেই ধুতির কোঁচা সামলে দিব্য ঘুরে বেড়াতাম। বুকে কোনোদিনই তেমন ভয়ডর নেই আমার। এই গ্রাম সেই গ্রাম — সারাক্ষণ ছুটে বেড়াই। ছয় ভাইয়ের পর আমি — বাড়িতেও তাই খোঁজখবর নেওয়ার বাড়াবাড়ি কখনই থাকত না। অতগুলো দামাল দস্যি ছেলেপুলে বাইরেই যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভাল — সবার ভাবখানা ছিল এমনই। আমরাও মনের সুখে সেই সব সুযোগ সুদে আসলে নিয়ে নিতে ভুলতামনা কোনোসময়।

মোটামুটি আমারই বয়সী তিনচারজনের দল বানিয়ে ঘোরা তো চলত। সাথে সাথেই পড়াশোনারও সুযোগ হল। আমাদের গ্রামে নিজস্ব কোনো স্কুল ছিলনা। শুধু কি স্কুল, হাসপাতাল, ডাক্তার, ঠিকঠাক কলঘর — কিচ্ছু ছিলনা। যাকে বলে একদম গণ্ডগ্রাম — আমাদের সুফলপুর ছিল তাই। তাতে অবশ্য সেই বয়সে আমাদের সেরকম দুঃখ হতোনা। সদরস্কুলে পড়তে যাব মোহরদিঘি পেরিয়ে — সেই উত্তেজনাতে ভর করেই রোজ স্কুল যাতায়াত শুরু করে দিলাম দিব্যি।

দিঘি পেরিয়েই অবশ্য শান্তি ছিলনা। পেরোতে হত মোহরপুরের বিশাল জঙ্গলও। এই এত্ত বড় বড় গাছ, তাদের আবার সব বিশাল বিশাল পাতা — মোটকথা সেই জঙ্গলে দিনের বেলাতেও ঝিঁঝি ডাকত — এতটাই ছিল অন্ধকার।

জঙ্গলমধ্যে পায়ে চলা এক সরু গলি গ্রামবাসীদের যাওয়া আসার ফলেই তৈরী হয়ে থাকবে। সেই পথ ধরেই আমরাও এর ওর হাতধরে একসময় ঠিক পৌছে যেতাম স্কুল চত্বর।”

মুস্তাক ফোড়ন কাটল। “এবাবা ঠাকুর— হাত ধরে যেতেন! এই যে বললেন ডাকাবুকো ছিলেন!”

লণ্ঠনটাকে উস্কে দিয়ে কথকঠাকুর হাসলেন। “অত ঘন অন্ধকারে একহাত দূরের জিনিসও ঠাহর হতনা ঠিকমতো। ভয় নয়, তবে হ্যাঁ, খানিকটা সতর্কতা তো বটেই। বাড়ি থেকেও পইপই করে বলে দিত বড়রা, তাছাড়াও বিষাক্ত
সাপখোপের প্রকোপ— বুঝিস তো সবই! তা সে যাই হোক, আসল গল্পে আসি এবার। - -

মাঝ শ্রাবণের সময়। শনি রবি টানা কূলকূল করে বৃষ্টি পরেছে। মাঠ দিঘি নদী সব এক হয়ে যেন ফুঁসছে রাগে। আমরাও তটস্থ। কারণ সেই সোমবার স্কুল যেতেই হবে।”

সৌমেন, নিখিল একসাথে প্রায় লাফিয়ে উঠল, “কেন?”

“সামনে বাইশে শ্রাবণ— সেই অনুষ্ঠানে আমিও তো শিল্পী। প্রথমবার স্টেজে উঠব। সবার সামনে পাঠ করব ‘শিশু’ থেকে, হাততালি পাবো — এর নেশা কিছুতেই ঘোচেনারে। এই উন্মাদনার বহরই আলাদা, ভীষণ অন্যরকম।"
‘ছ্যাঁক!’ উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর থেকে কড়াইয়ে গরম তেলে মাছ পরার আওয়াজ ভেসে আসে। আব্দুল তৃপ্তির হাসি হাসে। আজ দুপুরে ওর ধরা বড় কাতলাটারই সদগতি করছে মাসি। কথকঠাকুর আসলে এমনই হয়। কেমন যেন উৎসব উৎসব গন্ধ ম ম করে সারা বাড়ি জুড়ে। আব্দুল আরও একটু সরে বসে কথকঠাকুরের গা বরাবর। তার চুলে বিলি কেটে দেন ঠাকুর।

“সকাল সকাল বৃষ্টিটা ধরেছিল খানিক। সেই সুযোগে আমি আর দুবছরের ছোট মাসতুতো ভাই নরেন বেড়িয়ে পরলাম টুক করে। পাড়ে গিয়ে তো আমি অবাক। আমরা সাত আটজন একসাথে রোজ যেতাম। সেদিন দেখি কেউ নেই মোহরদিঘির ঘাটে। রহিমচাচার নৌকোয় এপার ওপার করতাম আমরা। সেও দেখি নিশ্চিন্তে নৌকো ঘাটে বেঁধে ঘুমোচ্ছে। আমি ডাক দিলাম, ‘ও চাচা, কিগো উঠবেনা!’ চাচা অমনি ধড়ফড় করে উঠে বসল। ‘অ! ইস্কুল খোলা বুঝি! যা দুর্যোগ!’

নরেনও কাঁধ খিমচে ধরে আমার। ‘দাদা, ঘরে চল। আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই বরং। শুধু তো নদী না, তারপর ওই জঙ্গল। আকাশ যা কালো করে আছে, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে থাকবেরে। চল বাড়ি ফিরে যাই!’

আমারও যে সেকথা মনে হয়নি, তা নয়, বুঝলি। কিন্তু যাওয়ার নেশায় বেশ রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে আমিই জোর করলাম — ‘কিচ্ছু হবেনা! আমরা কি ভিতু নাকি, যে এটুকু সামলাতে পারবনা! তার উপর আজ ফাইনাল রিহার্সাল! চল চল!’ অগত্যা চাচাও নিমরাজি হল। কথা রইল আমরা একটু আগেভাগেই বার হয়ে আসব আজ। চাচার নৌকোতেই ফিরব তাহলে।”

মুস্তাক চোখ গোলগোল করে শুধোয়, “তারপর? স্কুলে যাওয়া গেল ঠিকঠাক! ওই জঙ্গলে অসুবিধা হয়নি?”

“তেমন কিছু না। শুধু যাওয়ার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রোজ যেই পথ ধরে যাই, সেদিনও আন্দাজ মতো সেই পথই ধরলাম আমরা। মাঝরাস্তা বরাবর চলেও গেলাম। হ ঠাৎ একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো আমাদের। গন্ধটা কেমন যেন ঝিম ধরানো। মুখের মধ্যেটাও মিষ্টি মিষ্টি করে দিচ্ছিল। কিন্তু সেই মিষ্টতার মধ্যে ভাললাগা ছিলনা — যা ছিল তা কেমন এক নেশাধরানো আমেজ।”

অরিন্দম হাঁটুর উপর মাথা রেখে শুনছিল এতক্ষণ। এবার বলে উঠল, “কোনো বুনোফুলের গন্ধ কি?”
কথকঠাকুরের দৃষ্টিতে শূন্যতা। “নাঃ। কিকরে বোঝাবো, অনেকটা ভ্যানিলার মতো তীব্র আস্বাদ। তবে আইসক্রীমে তো একফোঁটার বেশী ভ্যানিলা এসেন্স থাকেনা! এখানে মনে হচ্ছিল যেন কয়েক শিশি ভ্যানিলা একসাথে পাক খাচ্ছে জঙ্গলে। আমরাও তার উৎস

সন্ধানে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। কেমন এক ঘোরের মধ্যে বোধহয় ছিলাম, বুঝলি? হঠাৎ পিছন থেকে সুখেন মাষ্টারমশাইয়ের গলা পেয়ে সম্বিৎ ফিরে এলো। রাশভারী লোক। হাঁক পাড়লেন, 'ওদিকে কোথায় চললি? স্কুল তো এদিকে। 'আমরা দৌড়ে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে চলে গেলাম। নরেন বলতে শুরু করেছিল, 'আসলে একটা গন্ধ —'
মাষ্টারমশাই ভ্রূ কুঁচকে উঠলেন, 'গন্ধ, কিসের?'
সত্যিই, বৃষ্টির সোঁদা গন্ধটুকু ছাড়া আর কোনো গন্ধই নেই তখন বাতাসে। সে যেমন এসেছিল, মিলিয়েও গেছে ততক্ষণে।

নিখিল হাঁ হয়ে বলল, "তারপর?"

আব্দুল জরিপ করল কথকঠাকুরকে। যেন অনেকদূর থেকে আসা কোনো গল্পের ফেরিওয়ালা তিনি! এমন নিশুত প্রহরেই কেন আটকে থাকেনা সময়? কেন এগিয়ে যায় সে, সকাল হয়, আর ঠাকুরও পাত্তারি গুটিয়ে চলে যান দিগন্তের পথে!

"তারপর স্কুলে গেলাম। যার জন্য এত কষ্ট করা, সেই রিহার্সাল তেমন একটা যদিও জমলনা। খুব কম ছাত্রের ভিড়, শিক্ষকরাও সবাই এসে উঠতে পারেননি। দুপুরের ব্রেকের পরই ছুটি হয়ে গেল তাই দুম করে।
আমরাও তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পরলাম। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পরেই চলেছে। হনহন করে হাঁটা লাগালাম দুই ভাই জঙ্গল বরাবর।
মোটামুটি আধঘন্টার রাস্তা। জোরে হাঁটলে কুড়ি মিনিটেই পৌছনো যায় দিঘির পাড়ে। কিন্তু কি যে হল সেদিন! ঘড়ি ছিলনা হাতে, তাও বেশ টের পেলাম, ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরপাক খাচ্ছি বনে, অথচ ঠিকঠিক মনে হলেও কিনারা কিছুতেই আর মিলছেনা! আরও খানিকক্ষণ এমন ভাবে ঘোরার পর বুঝলাম, নাঃ, আমরা রাস্তাই হারিয়েছি গভীর জঙ্গলে শেষমেশ।"
সব্বাই চুপ। গল্পের মোচড় দোলা দিচ্ছে তাদের শিশু হৃদয়কেও, বেশ টের পেল আব্দুল!

"এদিকে বৃষ্টির তোড় বাড়ছে। ছাতা একটা ছিল ঠিকই, তবে তাও সময় মতো বিগড়েছে। স্কুলের ব্যাগ মাথায় দিয়ে কোনোমতে কাজ চালাচ্ছি — কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ! দেখাও তো যায়না কিছুই! নরেন বেচারা দাদার ভরসায় বেড়িয়ে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হয়েছে। এবার দেখি সেও আর থাকতে না পেরে কেঁদে ফেলল, 'বাড়ি যাব।' আমিও কি ছাই থাকতে চাইছি আর! আমার বুকের ধুকপুকুনি জানান দিচ্ছে ততক্ষণে, সেখানেও ভয় বেশ জম্পেশ করেই বাসা বেঁধেছে। - -

হঠাৎ সকালের সেই মিষ্টি গন্ধটা ফিরে এলো আবার। বাড়ির পথ খোঁজার কথা বেবাক ভুলে গেলাম দুজনেই। সেই গন্ধের উৎস খুঁজতে ঢুকে গেলাম আরো গভীর জঙ্গলে। যেদিকটায় কোনো পায়ে চলার পথ ছিলনা। গা হাত পা কেটে যেতে লাগল বুনো লতাপাতার ঘর্ষণে, তবুও গন্ধের তীব্রতায় কিছু একটা নিশ্চয় ছিল যার কাছে বিনা যুদ্ধেই হার মানলাম যেন আমরা।

আরও এরকম বেশ খানিক চলার পর দেখতে পেলাম পুরোনো এক ভাঙাচোরা বাড়ি। বাড়ি যদিও বলা ভুলই হবে, যেন অট্টালিকা। এত বড় একখানা বাড়ি জঙ্গলের মধ্যে চাপা পড়েছিল অথচ আমরা কেউ জানতামই না! বেশ অবাক হলাম। খানিক স্বস্তিও মিলল। অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই তো হল!"

"কিন্তু অত পুরোনো বাড়ি! যদি সাপখোপ থাকে? আপনারা ঢুকে গেলেন?" অরিন্দম শুধোয়।

"তখন কি আর ভাবার সময় ছিল না ছিল বয়স! তার উপর ওই ঝিমুনি ধরানো গন্ধ! তখন মনে হচ্ছে, আগে একটু শুয়ে নিই। বৃষ্টি কমুক, তারপর বেরোনো যাবে ক্ষণ...

ব্যস, ঢুকেই পড়লাম বাড়ির মধ্যে শেষমেশ, বুঝলি? চারদিকে অশ্বত্থ গাছ উঠে গেছে বাড়িটার ভিত ফুঁড়ে, তবু মনে হল, কেউ যেন থাকে ওই ডেরায়। আমরা ছাড়াও আরও কেউ আছে। বা ছিল, শুধু দেখার চোখটুকু যা আমাদেরই নেই!

দেখলাম, নীচের তলার একটা ঘর বেশ পরিপাটি করেই রাখা। যেন আমাদের অপেক্ষাতেই। আমরাও ব্যাগগুলো একপাশে ফেলে সব ভুলে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম ওখানেই মেঝের উপর। বাড়ির চিন্তা করলামনা, ঘাটে চাচা দাঁড়িয়ে থাকবে ভুলে গেলাম, যে নরেন একটু আগেও কাঁদছিল, স্পষ্ট শুনতে পেলাম তার নাকডাকার আওয়াজ। ঘুম, বড় গভীর সে ঘুম গ্রাস করছে তখন আমাদের।”

সৌমেন মনে করায়, “আর সেই গন্ধ?”

“সেসব আর মনে নেই রে। ভুলেই গেছি কিসের টানে ঢুকেছি বাড়ির মধ্যে!

এমন করে কতক্ষণ ছিলাম জানিনা। চোখ খুললাম যখন, তখন চারদিকে অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ আর নেই। আমি আড়মোরা ভেঙে উঠে বসলাম। আমার সাথে সাথেই যেন এক অদৃশ্য ছায়ামূর্তিকেও স্পষ্ট দেখলাম, উঠে বসল। নিকষ আঁধারেও এ কিকরে সম্ভব! চমকে উঠলাম। শুধোলাম ‘কে? নরেন?’

অন্ধকারে চোখ ঠাহর হতে টের পেলাম সে তখনও ঘুমে অচেতন। ঘুমের ঘোরে নিজের নামটুকু শুনে শুধু বলল, ‘উঁহ্!’
কি বলব, আমি আড়ষ্টতায় তখন কথা বলতে পারছিনা আর। গলা শুকিয়ে বালির মতো কিচকিচ করছে মুখের মধ্যেটা। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নাকি দুঃস্বপ্ন? না না, স্পষ্টই তো দেখতে পাচ্ছি - ছায়ামূর্তি দিব্যি আমার পাশটিতে বসেই। আমারই মতো নিশ্চল একই ভঙ্গিতে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সেই ছায়া কিন্তু সরলনা। কিসের যেন অপেক্ষায় বসে আছে সে আমার দিকেই চেয়ে! আমারই সমান তার উচ্চতা, যেন আর এক আমিই! কিন্তু তা কিকরে সম্ভব? আমি তো দাঁড়িয়ে!

হঠাৎ যেন অবশ হয়ে পরা পা সম্বিৎ ফিরে পেল।

ঘরের দরজা কোনদিকে ঠাহর করে ঝাঁপ দিলাম সেইদিক লক্ষ্য করে। আর কি আশ্চর্য — কোনো দরজায় ধাক্কা খেলামনা! যেন শূন্য থেকে পড়ে যেতে শুরু করলাম আরও শূন্যে, আরও আঁধারের গভীরে। ফিরে এলো সেই মিষ্টি গন্ধ নাকে আমার!

কে বলে মৃত্যু তেঁতো, যন্ত্রণাময়! কই, তেমনটাতো আমার কাছে মনে হলনা!

শুধু নিভে যাওয়ার আগে শেষবার যেন টের পেলাম, অনেক মশাল একসাথে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ছায়ামূর্তি দূরে সরে যাচ্ছে— আরও আরও দূরে!”

সরলামাসি এসে দাঁড়িয়েছেন দোরে। আব্দুল ইশারায় জানতে চাইল কোনওরকমে, “তারপর?”

“তার পরেরটা বুঝলি কিচ্ছু মনে নেই। যখন ঘোর ভাঙল, বুঝলাম ওই মশালধারিরা আমাদের গাঁয়ের লোক — আমাদেরকেই খুঁজতে বেড়িয়েছিল। শুনলাম পুলিশ খোঁজখবর করেছিল কোনো দুষ্টচক্র কিছু নেশার মাধ্যমে ছেলেধরার ফাঁদ পেতেছিল কিনা ও বাড়িতে। ভাইয়ের জ্বর তাড়াতাড়িই নেমে গেল। অবশ্য দোতলা থেকে পড়ে হাত পা ভাঙায় আমি ভুগলাম আরও বেশ কিছুদিন।”

অরিন্দম অধৈর্য হয়, “কিন্তু হিসাব যে মিলছেনা কথকঠাকুর। তোমরা তো নিচের তলায় ছিলে, ওপরে উঠলে কখন? আর সেই ছায়ামূর্তি? তার কি হল?”

“সব হিসাব কি আর মেলে সবসময়! বন্যার জলে যখন ভেসে গেলি, তখন মিলেছিল? আঁস্তাকুড়ে যখন অনাহারে শুকিয়ে গিয়েছিল আব্দুল, তখন? সৌমেন, নিখিল যখন মাঝগঙ্গায় লঞ্চ উলটে হাঁকপাঁক করছিল, সেই সময় বুঝি মিলেছিল? বা মুস্তাকের পিঠে যখন ছুরির কোপ বসিয়েছিল ওর প্রাণের প্রিয় বন্ধু, তখন? এত কথাতেই বা যাচ্ছি কেন? সরলা! তোদের সরলামাসি, যাকে সম্পত্তির জন্য রেয়াত করেনি তার নিজের লোকজন! ও পেরেছিল কি হিসেবগুলো মেলাতে? এই যে আঁধাররাতের জমায়েত বসেছে এতসব সত্ত্বেও — এও কি আর মেলানো যায়? কথকঠাকুর তো, তাই জোড়াতালি দিয়ে মেলানোর চেষ্টা করি খানিক, এই যা! কিছু কি আর সত্যি সত্যি মেলে!”

সরলামাসি কোল থেকে নামায় আব্দুলকে। “আর রাত করবেননে ঠাকুর, ওদিকে সব যে জুড়িয়ে গেল!”

মাথার আঁচল ঠিক করে উঠে যায় সরলামাসি। স্পষ্ট দেখতে পায় আব্দুল, মাসির নিস্তেজ হেরে যাওয়া ছায়াটা তবুও ঠায় বসে থাকে দাওয়ায়!

তবু কই, মিষ্টি গন্ধটাতো নাকে মুখে ঠেঁকে যায়না তার? নাকি সবার কাছেই আলাদা আলাদা সেই শেষটুকুর আস্বাদ!

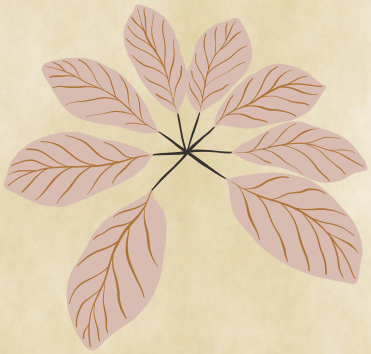

করোনা ডায়েরী

সৌমিক বসু

১ - মেলাবেন তিনি মেলাবেন

আমাদের কর্মজীবনের শুরুর দিকে সল্টলেক সেক্টর-৫ এর চায়ের দোকানগুলোতে কিছু টিপিক্যাল অনসাইট ফেরত দাদা দেখা যেতো। মাস খানেকের ছুটিতে দেশে ফিরে এই দাদারা হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও কলকাতার অফিসে একবার ঢুঁ মারতেন। চক্ষে রে-ব্যানের রোদচশমা, অঙ্গে গ্যাপের টী শার্ট, পদযুগলে নাইকির জুতো, পকেট থেকে লেটেস্ট মডেলের আইফোন উকি মারছে .....নিশ্চিন্দিপুরের দাদা ২ বছর নিউ জার্সিতে থেকে যেন করন জোহরের মুভি থেকে তুলে আনা শাহরুখ খান।

আর সেই দাদারা যখন ভাষন দিতেন বা নায়গ্রা ভ্রমনের বৃত্তান্ত বলতেন, চায়েরদোকানে শোরগোল পড়ে যেতো, দাদাকে ঘিরে ধরতো দাদার একটু চেনা, আধা চেনা সেজ-দাদা, মেজ-দাদারা, দোকানি হাঁ করে দাদার স্টেটসের গল্প শুনতে গিয়ে চা য়ে চিনি দিতে ভুলে যেতো, আশেপাশে শোরগোল পড়ে যেতো “অমুক দাদা ফিরেছেন”। আর এমনকি দোকানের নেড়ি কুকুর ভুলো কারোর দেওয়া বিস্কুটের টুকরো ফেলে সজল চোখে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো আর ভাবতো, “আমার কপালে কি আর সেই সৌভাগ্য হবে ? এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।”

সময় বদলেছে, দিন বদলেছে। এই করোনারী থ্রম্বোসিসের থেকেও ভয়ংকর করোনা ভাইরাস এসে এই দাদাদের মার্কেট ভ্যালু একেবারে চৌপাট করে দিয়েছে। প্রথমে তো রেখেঢেকে বলার চেষ্টা করেছিল, নিউ জার্সি থেকে আগের মাসেই ফিরেছে, বিশেষ কাজে চেন্নাইতে ছিলো গতমাসে। কিন্তু শাঁক দিয়ে কি আর মাছঢাকা যায়? ব্যাপারটা জানাজানি হয়েই গেছে। পাড়ার লোক দুর থেকে দেখতে পেলেই বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে দুরে চলে যাচ্ছে। বাবার বন্ধুরা সকালের মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে খোঁটা দিচ্ছে “মশাই, আপনার ছেলে নিউ জার্সি থেকে ফিরলো না? আইসোলেশনে আছে তো ?“ আনাচে কানাচে পাঁচিলের খাঁজ থেকে “এবিপি দু:খ”চ্যানেল,” “দু:খবাজার পত্রিকা,” “কাল আজ অউর কাল”পত্রিকার রিপোর্টাররা উঁকি মারছে আর ভাবছে, ব্যাটা আজ

পাড়ার বাইরে বেরোলেই ব্রেকিং নিউজ ছাড়বো। দাদার অবস্থা সুখেন দাসের থেকেও করুণ, দেশে ফিরে গৃহবন্দী দশা। কবে যে কর্মভূমিতে ফিরতে পারবেন তারও ঠিক নেই।করোনা আতঙ্কে সেক্টর ৫ এর সেই চায়ের দোকানও আজ খালি। শুধু সেই সারমেয় ভুলো সারাদিন চুপ করেশুয়ে থাকে আর মনে মনে গুনগুন করে গায়, “মেলাবেন তিনি মেলাবেন। “

২ - অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি

মানুষ যে এতো স্পর্শকাতর হতে পারে, করোনা পর্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। সবাই চারিপাশের মানুষকে যেভাবে অস্পৃশ্য হিসাবে দেখছে, তা আমাদের একটি বহু পুরনো ছবি “অচ্ছুতকন্যা “র কথা মনে করাচ্ছে। বছরের শুরু থেকেই চীন থেকে নিয়মিতভাবে খবর আসছিল,পরবর্তীকালে টম হ্যাঙ্কস দিয়ে শুরু হয়ে একে একে টম, ডিক, হ্যারি সবাই যখন কুপোকাত হতে শুরু করল, তখনই উপলব্ধি করেছিলাম অস্ট্রেলিয়ার নীল আকাশের নীচে অশনি সংকেত ঘনিয়ে এসেছে।

সপ্তাহান্তে বাজারের জন্যে বের হলে জনমানবশূন্য শপিং মল, খাঁ খাঁ করা রাস্তাঘাট মনে করাচ্ছে পরমাণু দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ের চের্নোবিল শহরের কথা। আশেপাশে সকলে মুখোশ পরে একে অপরের দিকে সন্দেহজনক চোখে তাকাচ্ছে, ঠিক যেন হিন্দি ছবির ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিচিত দৃশ্য। মুখোশেরও আবার রকমফের আছে। কারো মুখোশ জৈন ধর্মাবলম্বীদের মতন আপাতনিরীহ হলে কারো মুখোশ “সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্বস” সিনেমার নৃশংস খুনী ডক্টর হ্যানিব্যাল লেক্টরের মতোন। যে দুঃসময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবী আজ বন্দিদশায় আশঙ্কার প্রহর গুনছে, তার সাথে একমাত্র তুলনা চলে বার্গম্যানের সেই বিখ্যাত ছবি “দ্যা সেভেন্থ সিল” এর , যেখানে ক্রুসেডের যুদ্ধ ফেরত এক নাইটের সাথে স্বয়ং মৃত্যুকে সমুদ্র তীরে বসে দাবা খেলতে দেখা যায়।

এমন আপাত কঠিন ও রূঢ় বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কিছু অম্লমধুর স্মৃতিও আছে। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই দুই বন্ধুরকথা, যাদের সম্পর্ক শুরুতে ছিল খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ, কিন্তু যেই না এক বন্ধু বলেছেন, “মেরে পাস হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন হ্যায়”, তখনই হুমকি - পাল্টা হুমকি সবশেষে “মিথ্যে কেন লড়তে যাবি, ভেরি ভেরি সরি, মশলা খাবি ?” এই বলে সম্পর্কের বিয়োগান্তক পরিণতি হয়েছে। যাই হোক মহামারীতে রাজনীতি বা রাজনীতিতে মহামারীর কথা ছেড়ে অন্য কথা বলা যাক।

বহু সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস যেভাবে করোনা এক লহমায় বাড়িয়ে দিয়েছে, তা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। ঘরে ঘরে রসগোল্লা, জিলিপি, মায় বিরিয়ানি রান্নার প্রতিযোগিতা লেগেছে। যে হারু গান গাইলে পাড়ার নেড়ী কুকুর ভুলো পর্যন্ত পালিয়ে যেত, সে দিনরাত ফেসবুক লাইভ করছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় যুবসমাজ যেভাবে মদ্যকর্ষণ শক্তিতেআকৃষ্ট হয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রয়াস নিলেন, তা সত্যি অতি শ্লাঘার বিষয়।

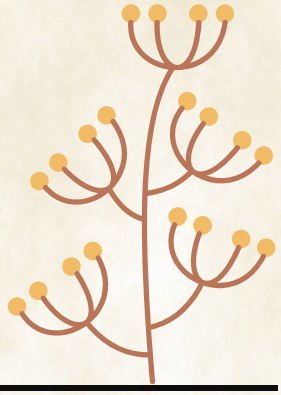

আর আমি বাড়িতে নিয়মিত ধূমায়িত ডালগোনা কফি সহযোগে জুমায়িত ভিডিও চ্যাটে বসছি,

আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবদের “আমরা ভালো আছি “ বলছি, ভালো থাকার অভিনয় করে চলেছি কারন আমরা সবাই জানি আসলে আমরা কেউই ভালো নেই। আশা করছি, এই গভীর অন্ধকার সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে খুব শীঘ্রই সেই আটপৌরে চেনা পৃথিবীকে ফেরত পাবো।

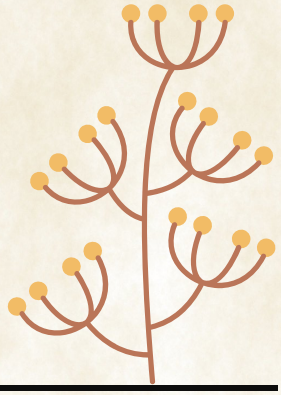

আশমান-জমিন

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরচন্দ্রিকা

আমি এই গল্পে কোথাও নেই| মানে, এই গল্পটা আমাকে নিয়ে নয়| এবার এই গল্প যাদের নিয়ে, তারা তো কোথাও একটা থাকে| সেই জায়গাটা, ধরা যাক, একটা পাড়া। আর ঘটনাচক্রে, সেই পাড়ায় আমিও থাকি| কিন্তু থাকলেই কি লেখা যায়? এই গল্প যাদের নিয়ে, সেই বিড্ডু, সঞ্জয়, প্রতীক, আকাশনীল, জিকো, অনুরাগ, ডাকু - এমন কী করেছে, যাতে ওরা হয়ে উঠতে পারে গল্পের চরিত্র, হাইজ্যাক করে নিতে পারে যে কোনও সহৃদয় পাঠকের পঁচিশ-তিরিশ মিনিট? আচ্ছা, ওরা যাদের প্রতি, ওদের অনেকের ভাষায়, 'ইন্টারেস্টেড', সেই শ্রেয়সী, মহুয়া, গুড্ডি, সংঘমিত্রা'রা কেউ কি ওদের দিতে পারে সেই প্রয়োজনীয় লিফট, যাতে কোনও একটা ঘটনা ওদের ভিতর থেকে একটি বা দুটি জুটিকে নিয়ে সাঁ করে উঠে যাবে আকাশপানে, নিদেনপক্ষে দশতলায়! আর আমরা টের পাব যে, না একটা ঘটনা ঘটল বটে? দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বোধহয় না| ওই সাইকেল, বড়জোর বাইক; কোনও লেক-ফেক কিংবা এখনও বেঁচে থাকা দু'একটা বড় মাঠের অন্ধকার; ক্বচিৎ-কদাচিৎ ভালো রেস্তরাঁ আর মাঝে মাঝে শহরের কোনও ঝাঁ চকচকে মলে শপিং| থুড়ি, জানলা শপিং| তো, এই নিয়ে আর নতুন কী-ই বা গল্প হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অম্বালিকা জড়িয়ে যাচ্ছে ওদের জীবনের সঙ্গে। বালিকা? না, অম্বালিকা| সে তো সাধারণ নয় যে উপেক্ষা করা যাবে, স্বপ্ন নয় যে রাত পোহালেই ভুলে যাওয়া যাবে, ভূত নয় যে স্মৃতিতে রেখে দেওয়া যাবে, ভবিষ্যত নয় যে অপলক তাকিয়ে থাকা যাবে| সে লঙ্কার সেই অতুলনীয় ঝাল, খাবারের ভিতরে থাকলে যা খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে অনেকটা, কিন্তু সরাসরি জিভে এসে লাগলে অ্যাক্সিডেন্ট| কিংবা একটা গল্প| যা এখন শুরু হতে চলেছে|

স্বপ্ন ও সকাল

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আকাশনীল যে স্বপ্নটা দেখছিল সেটা ও এখন ফি হপ্তায় তিন-চারবার দ্যাখে| নতুন কোনও রান্নার স্বপ্ন| তবে এবারে ঠিক রান্না নয়, গরম গলতে থাকা চিজে স্ট্রবেরি, আনারস, আপেল ডুবিয়ে নতুন যে থিম ডেজার্ট শহরের বড় বড় হোটেলের মেনু-কার্ডে জায়গা করে নিয়েছে, তাতে ছোট-ছোট মিষ্টি পাঁউরুটির স্লাইস জুড়ে দিলে স্বাদ বাড়বে না কমবে, তাই নিয়ে বসের সঙ্গে তর্ক চলছিল আকাশনীলের। ওর বসের ধারণা, ওই গলন্ত চিজে কোকো ঢেলে দিলে ব্যাপারটা অনেক আকর্ষণীয় হবে| কিন্তু আকাশনীলের বক্তব্য, কোকো দিলে জিনিসটা চকোলেটের এলাকায় ঢুকে যাবে| চিজের চিজত্ব আর থাকবে না| আর সেটা না থাকার মানে, আকাশনীল থেকে 'আকাশ' বাদ দিয়ে দেওয়া।
আকাশনীলের আকাশ অবশ্য বহুদিনই চার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় সেমেস্টারে প্রচন্ড চাপ শুরু হওয়ার পর থেকে! ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে কোনও বিশেষ শখ থেকে নয়, জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে পায়নি, তাই| কিন্তু চাপটার ভিতরে ঢুকে চাপটাকে, ভয় না পেয়ে, ভালোবাসতে চেষ্টা করে যারা, আকাশনীল তাদের দলেই। তাই ও বুঝে গিয়েছে, এই পেশায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে রান্নাটা জানতেই হবে| নইলে শুধু অর্ডার নিতে-নিতে আর খাবার সার্ভ করতে-করতেই বেলা বয়ে যাবে| রিসেপশন কিংবা অ্যাকাউন্টসে যাওয়াই যায়, কিন্তু তা হলে আর হোটেলে আসা কেন?

সে যাই হোক, সামান্য বেলা করে ঘুম থেকে উঠে আকাশনীল শুনল যে, অম্বালিকা ওর খোঁজে ওদের বাড়িতে এসেছিল| অম্বালিকা! আকাশনীল অবাক হয়ে গেল খানিকটা| আগে যখন এই কোর্সটায় ঢোকেনি, তখন অনেকদিন ও দাঁত মাজতে-মাজতে বাইরের গেটের সামনে দাঁড়াত আর দেখত হাঁটু পর্যন্ত ফিনফিনে স্কিন কালার মোজা পরে অম্বালিকা গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে| ঘাড়টা সামান্য উঁচু, সামান্য বাঁকানো| স্পর্ধায় নাকি তাচ্ছিল্যে? ওর মনে বহুবার এই প্রশ্ন জেগেছে, তবে উত্তর খুঁজবে কার কাছে? অম্বালিকা তো এয়ার হোস্টেসের ট্রেনিং নিতে শুরু করার পর আশপাশের কাউকে আর মানুষ বলেই মনে করত না! আকাশনীল যে তাতে কিছুটা হার্ট হয়নি, তা নয়! তবে মেয়েদের ব্যাপারে ওর মনের মধ্যে একটা ইগো ক্রিয়াশীল| একবার অষ্টমীর সন্ধ্যায় মহুয়া ওর হাত থেকে ধুনুচিটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বিড্ডুকে বলেছিল, 'বিড্ডু ভীষণ ভালো নাচে| তুই একটু বসে যা প্লিজ|' মনে-মনে সেদিনই ও মহুয়াকে বসিয়ে দিয়েছিল একদম| এইচএসের পর একসঙ্গে একটা সিনেমা দেখার জন্য মহুয়া ঝুলোঝুলি করছিল| কিন্তু মন তো আর ব্ল্যাকবোর্ড নয় যে, বারবার মোছা যাবে, লেখা যাবে আবার| মহুয়া তাই আর কোনওদিনই পাত্তা পায়নি ওর কাছে| কিন্তু অম্বালিকার ব্যাপারটা আলাদা| ও সেই ডিজাইনার কড়াইটার মতো, যেটাতে বসিয়ে রাঁধলে যে কোনও রান্নারই স্বাদ খুলে যেতে বাধ্য| অথচ খুব যে টানা-টানা চোখ, টিকলো নাক তা কিন্তু নয়, রংটাও ঝকঝকে ফর্সা না| বরং নরম হলদেটে একটা আভা! কিন্তু না ছোট, না বড় চোখ, একটু চাপা নাকের সঙ্গে ওই নরম রংটা এত অসামান্য জেল করে গিয়েছে যে, দশে দশ ছাড়া আর কিছু দেওয়ার নেই| আসলে আম্বালিকার অ্যাপিয়ারেন্স এমনই যে, প্রত্যেকটা ব্যাপার খুঁটিনাটি তলিয়ে দেখার অবকাশ পাওয়া যায় না| একটা দমকা ঝড়ে ওলটপালট হয়ে যায় সবকিছু| ওর স্বভাবের কাঠিন্য আর চেহারার পলি মিলেমিশে এমন একটা কন্ট্রাস্ট তৈরি করে, যার সামনে এসে অনেক মাতব্বরই তুতলে যাবে!

আকাশনীল তোতলায় না| কারণ ও কথাই বলে না| অবহেলা করার সুযোগই দেয় না অম্বালিকাকে। আর তাছাড়া ওরই বা সময় কোথায়? একটু বেলাবেলি বেরিয়ে সেই রাত করে ফেরা| আর সারাটা দিন একটা ঘরের মধ্যে কাটানো| ইতালিয়ান থেকে ইথিওপিয়ান রান্না - ওর স্পেশালাইজেশনের প্রত্যেকটা জানলা খুললেই ভেসে আসে নানারকম মশলার গন্ধ, নরম, কড়া নানারকম আগুনের আঁচ| বেশি কিছু এখনও না বুঝলেও আকাশনীল টের পায়, তাওয়ায় পড়লে তবে মশলার

আসল গন্ধ খোলে| অবশ্য তাওয়ার নীচে যদি আগুনের ছোঁয়া থাকে| ঘুম থেকে উঠে অম্বালিকার আসার খবরটা শুনে মনে হল, ও সেই ছোঁয়াটা পেয়েছে| অনেকটা মশলার গন্ধর মতোই ভাসতে-ভাসতে ও অম্বালিকার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল| বাড়িতে নেই শুনে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ| ওর মায়ের দেওয়া কফি খেল| আর অধৈর্যভাবে বেজে ওঠা কলিংবেলটা শুনেই বুঝল দরজার বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে! কিন্তু অম্বালিকার মা দরজাটা খুলতেই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল আকাশনীল| কেটে ফেলেছে? সামনের অত সুন্দর লকস দুটো কেটে ফেলেছে?

ওরা চারজন

বিড্ডু বলল, মাইরি কাল রাতের খবরটা শোনার সময়ও বুঝতে পারিনি, এতবড় একটা ধামাকা হতে যাচ্ছে| সঞ্জয় সিগারেটের কাউন্টারটা অনুরাগের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, চাপা উল্লাসের গলায় বলল, কেন, টিভিতে একদম স্পষ্ট করে জানাল তো, একসঙ্গে অনেককে ছাঁটাই করে দিয়েছে। অনুরাগ বরাবরই একটু চাপা | কিন্তু এই ব্যাপারটা এমনই যে, কৌটোর ঢাকনা না খুলে উপায় নেই| ও একটু নিচু গলায় বলল, এরকম দুম করে চাকরি খেয়ে নেওয়াটা একদমই উচিত নয়| যার যায়, সে-ই বোঝে কী হয়|

বিড্ডু খিঁচিয়ে উঠে বলল, আহা রে! তোর যে দরদ উথলে উঠল দেখছি| চাকরি গিয়েছে বেশ হয়েছে, উচিত শিক্ষা পেয়েছে|

-যেমন দেমাক ছিল, তেমনি দড়াম করে পড়ল মাটিতে | এবার দ্যাখ কেমন লাগে। সঞ্জয় ফোড়ন কাটল| অনুরাগ ওদের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসল শুধু| কিছু বলল না| ও জানে বিড্ডু আর সঞ্জয়ের কেন রাগ অম্বালিকার ওপর| আচ্ছা রাগ কি ওর নিজেরও একটু নেই? সেই যে পড়তে আসত ওর কাছে, একবছরের মাত্র ছোট হওয়া সত্ত্বেও খুব যত্ন করে 'দাদা' ডাকত আর সেই ডাকটা একটু নুনকাটা, একটু থ্রিলিং করে তুলত মাঝে-মধ্যেই, সেসব ভাবলে আজও কি গায়ে কাঁটা দেয় না অনুরাগের? দেয়| কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়লেই সমস্ত শরীর যেন চিড়বিড় করে ওঠে রাগে| কেন বলেছিল ও সংঘমিত্রার কাছে ওরকম একটা কথা?

প্রতীক ওর হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলল, কী হল বস, অম্বালিকার চাকরি যাওয়াতে তুমি মনে হচ্ছে ভীষণ মুষড়ে পড়েছ?

অনুরাগ আবারও কিছু না বলে হাসল| বিড্ডু জিজ্ঞেস করল, 'অম্বালিকা' নামটা যেন আসলে কার? প্রতীক কত কী পড়েছে, একটু বলতে ভালবাসে| ও তাড়াতাড়ি শুরু করে দিল মহাভারতের প্রসঙ্গ| 'অম্বা', 'অম্বিকা' আর 'অম্বালিকা'| এরা তিন বোন, এদের মধ্যে ভীষ্মের বিয়ে করার কথা ছিল...

অন্যদিকে কথাটা ঘুরে যেতে হাঁপ ছাড়ল অনুরাগ| কিন্তু মনের মধ্যে খচখচানিও একইসঙ্গে বাড়তে থাকল| ওই যে ভীষ্মের কথা বলছে প্রতীক, ভীষ্ম তো একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল! ততটা জোরালো না হলেও অনুরাগেরও একটা প্রতিজ্ঞা ছিল| সেদিন জন্ম নিয়েছিল প্রতিজ্ঞাটা যেদিন সংঘমিত্রা ওকে এসে বলেছিল, তুমিও নাকি ছক করার চেষ্টা কর অম্বালিকাকে? সাহস নেই বলে মুখ ফুটে কিছু বলতে পার না! শুধু হাবেভাবে বোঝানোর রাস্তা খোঁজো?

অপমানে নীল হয়ে গিয়েছিল অনুরাগ| দাঁতে-দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করেছিল, কে বলল?

- কে বলতে পারে? চোখ ছোট করে তাকিয়েছিল সংঘমিত্রা|

- হেঁয়ালি কোরো না| কে বলেছে সেটা বলো|অনুরাগ রেগে গিয়েছিল।

- অম্বালিকাই বলেছে| আবার কে বলবে? খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সংঘমিত্রা।

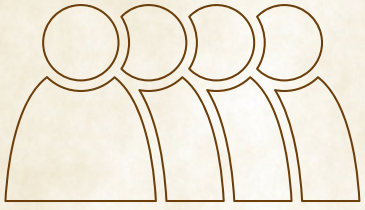

অনুরাগ সেদিন রাতেই ঠিক করে নিয়েছিল যে অম্বালিকার সঙ্গে আর কোনও কথা নয়| কোনও যোগাযোগই নয় আর। ঠিক করে নিতে নিতে শাওয়ারের জলে অনেকটা চোখের জল মিশিয়ে দিয়েছিল নিজের| লোকে যাকে বলে, 'ফিলিং'| আর লাটাইয়ের সুতোর মতো গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে, পরদিন থেকেই| এমনভাবে গুটিয়ে নিয়েছিল যাতে অম্বালিকা কিছু বুঝতে না পারে| তবু ও হয়তো বুঝতে পেরেছিল কিছুটা| ফোন করে জিজ্ঞেস করত মাঝে-মাঝে, অনুরাগ ওর ওপর রেগে আছে কি না।
-চটাচটি করার মতো সময় নেই রে। অনুরাগ এমন একটা উত্তর দিত, যাতে সিগন্যাল সবুজ হয়ে যায়, কিন্তু কুয়াশা কাটে না|
কেন কাটাবে কুয়াশা? অম্বালিকা ভেবে দেখুক, ও কবে কোন অন্যায় করেছে অনুরাগের সঙ্গে| ভেবে তল না পেলে, আবার ভাবুক| যদি অবশ্য অনুরাগের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় ওর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়! অবশ্য কষ্ট হলেও অনুরাগের আজ আর কিছু করার নেই| ও আজ অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে...

অনুরাগ জানে, সেই মেয়েটার প্রতি ওর একটা দায়বদ্ধতা আছে| আজকের ব্যাপারটা ওকে বলে দেওয়া উচিত! কিন্তু কীভাবে বলবে সেই কুয়াশাটার কথা, যার পিছনে একটা মুখ আজও অসম্ভব স্পষ্ট?

একটি কুঁড়ি, দুটি পাতা

- মনে আছে তো গুরু, আমাদের সঙ্গে কী লাফড়া হয়েছিল? কতদূর গিয়েছিল কেসটা? বিড্ডু সঞ্জয়কে বলল|
- মনে আবার নেই| কিন্তু যাই বল, কেসটা কিচাইন হয়ে গেল শুধু তোর জন্য | নইলে...
- আচ্ছা, এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ! তুই ডেকে আনতে বলিসনি অম্বালিকাকে? বিড্ডু রেগে গেল |
সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বলেছিলাম| কিন্তু আনার সময় হাত তো ধরতে বলিনি|
সে তো রাস্তায় সাঁ-সাঁ করে লরি ছুটছিল, যদি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে ধরেছিলাম| ওটাই বড় হল? বিড্ডু অভিমানভরা গলায় বলল|

- বড় হল, না ছোট হল তার ফল তো আমরা হাতেনাতেই পেলাম! শ্রেযসীর মা রিপোর্ট দিল যে, তুই নাকি অম্বালিকার হাত ধরে টানতে-টানতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলি। শুনে, গুড্ডি আর আরও দুটো মেয়ে রিহার্সাল থেকে বেরিয়ে গেল| পুরো নাটকটাই চৌপাট হয়ে গেল আমাদের|
- শুধু নাটক বলছিস কেন, আমাদের গ্রুপটাই তুবড়ে গেল, নীল-ফিলরা আমাদের মতো ছেলেদের সঙ্গে রিলেশন রাখবে না বলল; পাড়ার মেয়েমহলে ফালতু ছোট হয়ে গেলাম আর অম্বালিকা আমাদের সাপোর্টে একটা কথা পর্যন্ত বলল না|
-চুপ কর| এগেনস্টেই বা ক'টা কথা বলেছে? যদি সবটা বলে দিত, তুই আমি পাড়ায় থাকতে পারতাম?

বিড্ডু চুপ করে গেল| চোখ বন্ধ করলে এখনও সেই ষষ্ঠীর রাত| পাড়ার ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে মিলে নাচের প্রোগ্রাম| সলিল চৌধুরী দিয়ে শুরু, ভাংড়া দিয়ে খতম। পুরো ককটেল| কিন্তু ধুনকি লাগার আগেই বিড্ডুর হঠাৎ মনে হল, ও নাচবে আর অম্বালিকা থাকবে না স্টেজে? পাড়ার সবচেয়ে ভাল ডান্সার নাচবে আর সবচেয়ে স্মার্ট মেয়েটাকে কেউ খুঁজে পাবে না ধারেকাছে? হয়? হোক বা না হোক, বিড্ডুর মনে হওয়াটা মনেই ছিল| কিন্তু বাক্সে দেশলাইটা ঘষে দিল সঞ্জয়| ঘুরে-ঘুরে বলতে থাকল, অম্বালিকাকে ডেকে নিয়ে আসতে| আগুন তো সংক্রামক| একসময় দপ করে জ্বলে উঠল বিড্ডুর মাথায়|

তখন, ‘কে মালিক কে সে রাজা’, বিড্ডু স্ট্রেট অম্বালিকাকে গিয়ে বলল, একটা মেয়ের পায়ে হঠাৎ চোট লেগেছে, তোমাকে ওর জায়গায় একটু পারফর্ম করে দিতে হবে|
অম্বালিকা একইরকম সোজাসাপটা ভাবে বলল, আমি পারব না গো। আর কথাটা শুনে বিড্ডু চলে যাচ্ছে দেখে বলল, যাওয়ার আগে আমার একটা উপকার করো প্লিজ। একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এনে দিয়ে যাও!
বাক্সর দেশলাইটা মাথার ভিতরে জ্বলে উঠেছে তখন| বিড্ডু রাস্তার ধারের স্টল থেকে কোল্ডড্রিঙ্কসটা কিনে একটু আড়ালে গিয়ে আলগা করে খেয়ে নিল দু'ঢোঁক| তারপর ওর পকেটের ছোট্ট বোতলটায় যে পানীয়টি ছিল, সেটার প্রায় পুরোটাই ঢেলে দিল কোল্ডড্রিঙ্কসের ফাঁকটুকু ভরাতে| তারপর স্ট্র সমেত বোতলটা নিয়ে গেল অম্বালিকার কাছে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল মেয়েটা কীরকম দু'চুমুকে সেটা শেষ করে| শেষ করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অম্বালিকা বিড্ডুর কাছে এসে বলল, চলো, তোমাদের যেখানে রিহার্সাল হচ্ছে সেখানে আমাকে নিয়ে চলো|
ওর কথা শুনে বিড্ডুর ভিতরে একটা ধুকপুকুনি শুরু হল, কিন্তু তখন তো আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই! ওদের পাড়ার পুজোমণ্ডপ থেকে ওদের নাচ-গানের রিহার্সালের জায়গাটা একটু দূরে| সদ্য প্রোমোট হওয়া একটা বাড়ির ফাঁকা একতলাটাই রিহার্সাল রুম হিসেবে ব্যবহার হত। তো, সেখানে যাওয়ার পথে মাঝে-মাঝেই টাল খেয়ে যাচ্ছিল অম্বালিকা| সামলেও নিছিল অবশ্য। সেভাবেই একবার সামলে উঠে বিড্ডুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর নাম করে আমায় কী খাওয়ালে?
বিড্ডু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরে বলল, অল্প, খুব অল্প একটু...

বিড্ডুর থেকে ব্যাপারটা শুনে একটু থম মেরে গিয়েছিল সঞ্জয়। তারপর গল্পটা পুরো ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছিল, বিড্ডু তোমায় কোল্ড ড্রিঙ্কসই খাইয়েছে অম্বালিকা| তার ভিতরে কী ছিল, সেটা দোকানদার জানে| ওর জানার কথা নয়|

তার একটু পরেই আকাশনীলরা চলে এসেছিল অম্বালিকাকে পুজোমণ্ডপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আর ওদের অপমান করতে| সঙ্গে শ্রেযসীর মা| কিন্তু অম্বালিকা ওই কোল্ড ড্রিংকের ভিতরের ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খোলেনি কোথাও|

বিড্ডুও একটা ব্যাপার কখনও কোথাও ফাঁস করেনি| সঞ্জয়ের কাছেও নয়| সেদিন রাতে ওই টালমাটাল অবস্থায় ওর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে অম্বালিকা ওদেরই গ্রুপের একটা ছেলের কথা বারবার জিজ্ঞেস করছিল। সেই ছেলেটার নাম 'আকাশনীল' হলে বিড্ডু অবাক হত না| কিন্তু সেই ছেলেটার নাম 'আকাশনীল' নয় |

বড় ভয় করে

- দেখেছিস, কাগজে ছবিটা দেখেছিস? একসঙ্গে দু'টো লবঙ্গ মুখের মধ্যে পুরে গুড্ডি বলল |
- দেখব বলেই তো আমি আজ তিনটে কাগজ কিনেছি| দু'টো ইংরেজি আর একটা বাংলা| সংঘমিত্রা গদগদ গলায় বলল|
- মোট চারটি কাগজে বেরিয়েছে, গুড্ডি সবজান্তা গলায় বলল|
- তুই কী করে জানলি? সংঘমিত্রা উৎসুক|
- হুঁ হুঁ বাবা, খবর রাখতে হয়। গুড্ডি সোর্সের নাম ঠিকানা বলল না|
সংঘমিত্রাও ঘাঁটাল না| বরং খুশি খুশি গলায় বলল, শেষ পর্যন্ত একদম গাছতলায় বসিয়ে দিল এয়ারবাস থেকে!
- শুধু বসে থাকলে তবু কথা ছিল! কপালে হাত দিয়ে বসে আছে। গুড্ডি একটা লবঙ্গ চালান করল সংঘমিত্রার হাতে|

- তা হলে কপাল পুড়ল বল অম্বালিকার?
- মুখ পুড়ল। গুড্ডির গলায় ঝাঁঝ|
- পোড়াই উচিত| সেবারে তুই এইচএসএ হায়েস্ট পেলি গোটা পাড়ায়, আর অম্বালিকা শুধু ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়াতেই ওকে নিয়ে কী মাতামাতি!
- ও তো মডেল তাই না? পাড়ার রাস্তাগুলো তো ওর জন্য রাস্তা নয়! ওগুলো সব র‍্যাম্প! ও হাঁটলে যা এফেক্ট হবে, আমি হাঁটলে তাই হবে কেন বল?
- কিন্তু যাই বল, ও তোকে একটু সমঝে চলে| সেই যে তুই ওর সঙ্গে একসঙ্গে নাচিসনি...
- কেন নাচব? আমরা সবাই পনেরো-কুড়িদিন ধরে রিহার্সাল দিলাম, আর উনি হঠাৎ করে হুট বলতে ছুট হয়ে এসে স্টেজে উঠবেন? কেন ও কে? দীপিকা না ক্যাটরিনা কাইফ?
- নিজেকে সেরকমই কিছু ভাবে বোধহয়। সংঘমিত্রা ঠোঁট বেঁকাল |
- ভাবে না, ছেলেগুলো ভাবায়| ওই আকাশনীল, বিড্ডু, অনুরাগ, ওরাই তো সব ওকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে|
- অনুরাগ নয় রে, অনুরাগ অন্যরকম। সঙ্ঘমিত্রা বলে উঠল।
- তুই তো বলবিই| তুই এখন ওর সঙ্গে প্রেম করছিস যে।
- না, আমার সঙ্গে রিলেশন আছে বলে বলছি না, অনুরাগ সত্যি আলাদা| তবে আমি না একটা ব্লান্ডার করে ফেলেছি, জানিস।
- কী ব্লান্ডার করেছিস?
- ইন ফ্যাক্ট আমি অম্বালিকার নাম দিয়ে কতগুলো বাজে কথা অনুরাগকে বলেছি| কিন্তু আসলে তো অম্বালিকা কথাগুলো ওর সম্পর্কে বলেনি| আমিই পুরোটা বানিয়ে বানিয়ে...
- কেন?
- আসলে তখন ওর প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিলাম একেবারে...
- প্রেমে নয় সংঘমিত্রা, তুই অম্বালিকার উপর হিংসেয় পাগল হয়ে উঠেছিলি|
- নট এগজ্যাক্টলি| অনুরাগকে আমার ভাল লাগতই| আর ওর অম্বালিকার প্রতি একটু দুর্বলতা আছে দেখেই আমি মিথ্যেগুলো বলেছিলাম|
- অনুরাগের যদি আমার প্রতি দুর্বলতা থাকত, তা হলে তুই কথাগুলো বলতি?
- ধ্যাত, তুই তো আমার বন্ধু| আর তা ছাড়া...
- আমাকে দেখলেই ছেলেদের মাথা ঘুরে যাওয়ার একদমই কোনও আশঙ্কা নেই কী বল?
- ঠিক তাই| কিন্তু না| মানে, আমি এটা বলতে চাইনি|
- তুই কী বলতে চাইছিস, আমি খুব ভাল বুঝতে পেরেছি| আর তার জন্য আমি তোর ওপর একটুও রাগ করিনি| আমি শুধু একটা আত্মসমীক্ষা করছিলাম|
- কী পেলি সেই সমীক্ষা থেকে?
- দ্যাখ, ছেলেরা অন্য একটা ছেলের ভিতরের ক্ষমতাটাকে ভয় পায়| একজনের পোটেনশিয়ালের সঙ্গে অন্য একজনের পোটেনশিয়ালের লড়াই হয়| কিন্তু আমরা মেয়েরা মোস্টলি অন্য একটা মেয়ের অ্যাপিয়ারেন্সকে ভয় পাই, তাই না?
- ওই অ্যাপিয়ারেন্সই তো বাজি মেরে দেয় রে গুড্ডি! নইলে তোর মতো এত ব্রিলিয়ান্ট একটা মেয়ে পাড়ায় থাকতে ছেলেরা ওকে নিয়ে লাফায় কেন?
- আর অনুরাগ যতই অন্যরকম হোক, শেষমেশ, ওদের দলেরই একজন, কী তাই তো?
- আফটার অল অনুরাগও একটা ছেলে| কিন্তু আমি ভাবছি, অনুরাগের সামনে গিয়ে যদি ন্যাকা কান্না কাঁদে এখন, তাহলে কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে গিয়ে আমি তো একদম ডুবে যাব রে?

- অনুরাগ তো ওর সঙ্গে কথাই বলে না, অ্যাট লিস্ট আমি তো সেরকমই জানতাম!
- বলত না তো| কিন্তু আজ চাকরি খোয়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই ডাইনিটা অনুরাগকে মেসেজ পাঠিয়েছে|
- হোয়াটস অ্যাপ করেছে না এসএমএস? সে যাই করুক, কী লিখেছে?
- সেটাই তো অনুরাগ বলল না| কিছুতেই না| আর তাই আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি| আমি তো তোর মতো আত্মসমীক্ষাও করতে পারি না| আমার কী হবে রে গুড্ডি?

সামনে পেয়েও

জিকো জীবনে একটা লাথিও মারেনি ফুটবলে| বরং ওর নামটাই ওকে লাথি মারতে-মারতে নিয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে| আর ওর কাজটাও হয়েছে একেবারে তেমনই| ছাত্র ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি| সারাদিন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ শোনা আর রাতে জেনারেল সেক্রেটারি এবং আরও বড় নেতাদের গালিগালাজ সহ্য করা| উফ অসহ্য! জিকো ঠিকই করে নিয়েছে, সামনের বছর যদি কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি মানে জিএস হতে পারে তো তোফা, নইলে গুডবাই পলিটিক্স!

মন্দের ভাল হল, জিকোর একজন পার্সোনাল সেক্রেটারি আছে। না, মেয়ে নয়। ছেলে| ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল যখন বাচ্চাটা, তখন জিকোর বাবা-মা'ই ওর অনেকটা ভার নেন| সেই সময় থেকেই ছেলেটি জিকোর সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত| আর এখন তো বিনে মাইনের সেক্রেটারি| কেউ-কেউ বলে, কৃতজ্ঞতা| কিন্তু জিকো ভেবে দেখেছে, একটা সময়ের পর কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসাকে আলাদা করা যায় না| অনেকটা ওর আর ডাকুর মতোই|

তো এহেন ডাকু সকাল সকাল এসে ঘুম ভাঙিয়ে নিজের মোবাইলটা জিকোর কানে ধরিয়ে দিল| আর জিকো মাথাভর্তি ঘুম নিয়েও মুহূর্তে বুঝল, ওর চোখ-মুখ জলের ঝাপটা ছাড়াই ফ্রেশ হয়ে যাবে আজ|
- আমাকে তোমাদের কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবে? অম্বালিকা দু'বার বলল|
- কিন্তু তুই তো এয়ারহোস্টেস | কলেজে কী করবি?
- তুমি টিভি দ্যাখো না? খবরের কাগজ পড়ো না? অম্বালিকা একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল|
- না রে, টিভি দেখার সময় নেই| আর ডাকু হকারি শুরু করার পর থেকে আমি খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি|
- বেশ করেছ| নইলে জানতে পারতে, কেন ফোন করেছি। অম্বালিকা হতাশ গলায় বলল|
জিকো ততক্ষণে ডাকুর বাড়িয়ে দেওয়া কাগজটার হেডলাইন দেখে নিয়েছে| ও খুব অবাক গলায় বলল, এ তো সর্বনাশ করে দিয়েছে রে| একসঙ্গে হাজার- বারোশো কর্মীকে ছাঁটাই! বলতে-বলতে জিকো ডাকুর বাড়ানো আর-একটা কাগজে অম্বালিকার গাছের নীচে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকা ছবিটাও দেখে নিল| দেখতেই থাকল|
- আমি এখন কী করব বলতে পারো?
অম্বালিকার গলাটা খুব টেন্সড শোনাল| জিকো বলতে যাচ্ছিল, আর যাই কর গাছতলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকিস না| কিন্তু সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হয়ে যাবে ভেবে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো আছি|
- থ্যাঙ্ক ইউ| তোমার উপর সেই ভরসাটুকু আছে বলেই আমি ডাকুকে ধরেছিলাম|
জিকো মনে-মনে বলল, সোজা আমাকেই ধরতে পারতিস! মুখ দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল|

- অনুরাগ তো ওর সঙ্গে কথাই বলে না, অ্যাট লিস্ট আমি তো সেরকমই জানতাম!
- বলত না তো| কিন্তু আজ চাকরি খোয়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই ডাইনিটা অনুরাগকে মেসেজ পাঠিয়েছে|
- হোয়াটস অ্যাপ করেছে না এসএমএস? সে যাই করুক, কী লিখেছে?
- সেটাই তো অনুরাগ বলল না| কিছুতেই না| আর তাই আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি| আমি তো তোর মতো আত্মসমীক্ষাও করতে পারি না| আমার কী হবে রে গুড্ডি?

জিকো জীবনে একটা লাথিও মারেনি ফুটবলে| বরং ওর নামটাই ওকে লাথি মারতে-মারতে নিয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে| আর ওর কাজটাও হয়েছে একেবারে তেমনই| ছাত্র ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি| সারাদিন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ শোনা আর রাতে জেনারেল সেক্রেটারি এবং আরও বড় নেতাদের গালিগালাজ সহ্য করা| উফ অসহ্য! জিকো ঠিকই করে নিয়েছে, সামনের বছর যদি কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি মানে জিএস হতে পারে তো তোফা, নইলে গুডবাই পলিটিক্স!

মন্দের ভাল হল, জিকোর একজন পার্সোনাল সেক্রেটারি আছে। না, মেয়ে নয়। ছেলে| ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল যখন বাচ্চাটা, তখন জিকোর বাবা-মা'ই ওর অনেকটা ভার নেন| সেই সময় থেকেই ছেলেটি জিকোর সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত| আর এখন তো বিনে মাইনের সেক্রেটারি| কেউ-কেউ বলে, কৃতজ্ঞতা| কিন্তু জিকো ভেবে দেখেছে, একটা সময়ের পর কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসাকে আলাদা করা যায় না| অনেকটা ওর আর ডাকুর মতোই|

তো এহেন ডাকু সকাল সকাল এসে ঘুম ভাঙিয়ে নিজের মোবাইলটা জিকোর কানে ধরিয়ে দিল| আর জিকো মাথাভর্তি ঘুম নিয়েও মুহূর্তে বুঝল, ওর চোখ-মুখ জলের ঝাপটা ছাড়াই ফ্রেশ হয়ে যাবে আজ|
- আমাকে তোমাদের কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবে? অম্বালিকা দু'বার বলল|
- কিন্তু তুই তো এয়ারহোস্টেস | কলেজে কী করবি?
- তুমি টিভি দ্যাখো না? খবরের কাগজ পড়ো না? অম্বালিকা একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল|
- না রে, টিভি দেখার সময় নেই| আর ডাকু হকারি শুরু করার পর থেকে আমি খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি|
- বেশ করেছ| নইলে জানতে পারতে, কেন ফোন করেছি। অম্বালিকা হতাশ গলায় বলল|
জিকো ততক্ষণে ডাকুর বাড়িয়ে দেওয়া কাগজটার হেডলাইন দেখে নিয়েছে| ও খুব অবাক গলায় বলল, এ তো সর্বনাশ করে দিয়েছে রে| একসঙ্গে হাজার- বারোশো কর্মীকে ছাঁটাই! বলতে-বলতে জিকো ডাকুর বাড়ানো আর-একটা কাগজে অম্বালিকার গাছের নীচে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকা ছবিটাও দেখে নিল| দেখতেই থাকল|
- আমি এখন কী করব বলতে পারো?
অম্বালিকার গলাটা খুব টেন্সড শোনাল| জিকো বলতে যাচ্ছিল, আর যাই কর গাছতলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকিস না| কিন্তু সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হয়ে যাবে ভেবে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো আছি|
- থ্যাঙ্ক ইউ| তোমার উপর সেই ভরসাটুকু আছে বলেই আমি ডাকুকে ধরেছিলাম|
জিকো মনে-মনে বলল, সোজা আমাকেই ধরতে পারতিস! মুখ দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল|

- একটা উপকার করবে? আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আজ একটা মিছিল আছে| এইসব পলিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপারে আমি কখনও যাইনি, অথচ এটাতে না গেলেও নয়! তুমি কি আমার সঙ্গে একটু এয়ারপোর্টে যাবে?
- আমার আজ দুপুরে একটা জরুরি মিটিং আছে বুঝলি, তাও আমি দেখছি। জিকো একটুও না তুতলে বলল|
- তুমি না গেলে আমি খুব অসুবিধেয় পড়ে যাব| প্লিজ একটু দ্যাখো! আমি আমার কাগজপত্র নিয়ে তোমার বাড়িতে যাব একবার? তোমার তো বড় লেভেলে যোগাযোগ।অনেক লিডার-টিডার চেনা আছে নিশ্চয়ই। অম্বালিকা কীরকম একটা মরিয়া গলায় বলল|
- বাড়িতে আসবি? আয়! জিকো সহজ গলায় বলল|

কিন্তু ওর মাথার ভিতরে তখন জটিল একটা সিঁড়িভাঙা অঙ্ক চলছে| মহুয়া বেশ কিছুদিন ধরেই ওর ওপর টাল্লি খেয়ে রয়েছে, ও বুঝতে পারে! ধুনোও দেয় ব্যাপারটায়| কারণ দজ্জাল আর ঠোঁটকাটা বলে মহুয়ার একটা ভাল ফ্যান ফলোয়িং আছে মেয়েদের মধ্যে| জিএস হতে গেলে ওদের সবার ভোটই চাই জিকোর| আর চাই বলেই জিকো এখন চটাতে পারবে না মহুয়াকে| কিন্তু অম্বালিকার সঙ্গে ও মিছিলে হাঁটতে গিয়েছিল শুনলে মহুয়া আগুন লাগিয়ে দেবে একদম| তা হলে এখন কী করণীয়? ব্যাপারটা সংক্ষেপে ডাকুকে বলে একটা পরামর্শ চাইল জিকো|
ডাকু বিড়বিড় করে বলতে থাকল, তিন, চার, তিন|
- কী ফালতু তিন, চার, তিন করছিস? জিকো চটে গেল |
- গুনছি, পাড়ার কোন মেয়ে আজ ক'টা পেপার কিনেছে| মহুয়া তিনটে|
- এতগুলো পেপার কিনেছে কেন?
- তোমার বালিকার গাছতলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকার ছবি কালেক্ট করবার জন্য এটুকু ইনিশিয়েটিভ নেবে না?
জিকো হতাশ গলায় বলল, আমার বালিকা নয় রে| পলিটিক্সের জন্য আমার কাছে আসতে চাইছে|
ডাকু একটু হেসে বলল, তা তুমি একটু কাছে গিয়েই পলিটিক্স করো না|
- মুশকিল হল, ওকে কাছ থেকে দেখলেই আমার যে পলিটিক্স ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। জিকো ফিসফিস করে বলল, ডাকু শুনতে পেল না|

মাফ করো

বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে একটা ছোটখাটো খাওয়াদাওয়া হয় পাড়ায়| আর তার প্রায় যাবতীয় দায়িত্ব থাকে, ইয়ং ব্রিগেডের ওপরেই| বাজার করা থেকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত|
- অম্বালিকাকে নেমন্তন্ন করতে যাবি নাকি আজ? শ্রেয়সী কথাটা হওয়ায় ভাসিয়ে দিল|
- গিয়ে কী বলব? প্রতীক জিজ্ঞেস করল|
- বলবি যে, দেখলাম তোর চাকরি-ফাকরি এখন নেই, মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকবি কেন, আয় আমাদের সঙ্গে একটু এনজয় কর|
- শাট আপ শ্রেয়সী, মহুয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল। আফটার অল মেয়েটার সঙ্গে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আজ| ওর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দ্যাখ তো!
- ওর জায়গা যদি আমি নিতে পারতাম তা হলে এই এত বড় থলিটা আমাকে দিয়ে বওয়াত না কেউ! শ্রেয়সী খুব অভিমানের গলায় বলল|
বিড্ডু তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে থলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, আগে বলবি তো!

শ্রেয়সী মহুয়ার ঝাড়টা বিড্ডুর উপর উপুড় করে দিয়ে বলল, তোকে সব কিছু বলে বোঝাতে হবে কেন? তুই না বললে কিছু বুঝতে পারিস না?
বিড্ডু আলতো করে পাশে দাঁড়ানো সঞ্জয়কে বলল, যেমন মা তেমন মেয়ে| জিভে এলাচ দাঁড়াবে না |
- যাই বল, মা ওরকম ঝাড়টা দিয়েছিল বলেই কিন্তু মেয়ে সিমপ্যাথি গ্রাউন্ডে তোর প্রেমে পড়ল। সঞ্জয় ফিসফিসিয়ে বলল |
- অ্যাই তোরা এত কী গুজগুজ ফুসফুস করছিস রে? মহুয়া একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল |
- না, আমি বলছিলাম অম্বালিকাকে ডাকতে প্রতীককে পাঠালে কেমন হয়? সঞ্জয় বলটা পুরো গুগলি করে দিল |
প্রতীক নিজের মনে কী যেন একটা ভাবছিল| আঁতকে উঠে বলল, আমি? কেন, আমি কেন?
- তুই হলে অসুবিধে কী? বিড্ডু আর সঞ্জয় একসঙ্গে বলল|
- আমি যদি যাই, তবে আকাশনীলকে সঙ্গে নিয়ে যাব। প্রতীক একটা প্রতিরোধের গলায় বলে উঠল |
- আকাশনীল কেন? শ্রেয়সী জিজ্ঞেস করল|
- ও বোধহয় চাইছে, ওদের দু'টো গ্রুপেরই রিপ্রেজেন্টেশন থাক। মহুয়া বিজ্ঞের ভাব করে বলল|
- না, না ওসব গ্রুপ-ফুপ এখন আর এগজিস্ট করে না। প্রতীক মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলল। আমি আকাশনীলকে চাইছি, কারণ অম্বালিকা ওকেই যা হোক একটু ...
ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বিড্ডু আর সঞ্জয় কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই মহুয়া ফোন করে কাউকে একটা জানাতে থাকল যে, ওরা ঠিক কোথায়, আর মিনিটখানেকের মধ্যেই সংঘমিত্রা উল্কার মতো আছড়ে পড়ল ওদের মধ্যে| সঙ্গে ডাকু |
- অম্বালিকা ছক করছে| আবারও অনুরাগকে ছক করছে| ডাকু ওকে আর অনুরাগকে সিনেমাহলের সামনে একসঙ্গে দেখেছে। সংঘমিত্রা ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল|
- কী যা তা বলছিস! অনুরাগ আর অম্বালিকার মধ্যে কোনও কেমিস্ট্রি কখনও হতে পারে? প্রতীক অবিশ্বাসের গলায় বলল|
- কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি সবই হতে পারে| সেবার পুজোর সময়
অম্বালিকা বারবার জিজ্ঞেস করছিল, অনুরাগ রিহার্সাল রুমে আছে কি না| আর যে অবস্থায় জিজ্ঞেস করছিল, সে অবস্থায় লোকে চট করে মিথ্যে কনসার্ন দেখায় না, বিড্ডু একনিশ্বাসে কথাগুলো বলল|
সঞ্জয় অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল| - তুই আগে আমাকে এই ইন্সিডেন্টটা বলিসনি তো?
বিড্ডু মনে মনে বলল, সব কথা সব সময় বলা যায় না| আর ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাকু বলে উঠল, তা হলে আমার দেখার ওপরে আর কারও সন্দেহ রইল না আশা করি?
মহুয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, জিকো আজ দুপুর থেকে কোথায় রে? ফোনে পাচ্ছি না কেন?
ডাকু একটা ঢোঁক গিলল| জিকো কোথায়, কার সঙ্গে, সে ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন যাতে না ওঠে তাই তো ও একটু কায়দা করেই অনুরাগের ব্যাপারটা উসকে দিয়েছে। থ্রিলারটাকে একমুখী করানোর জন্য অম্বালিকার সঙ্গে যে আকাশনীলও ছিল সেই তথ্যটাই গোপন করে গিয়েছে| এসবই তো একজন সেক্রেটারির কাজ| বুঝবে না, ওরা বুঝবে না| বোঝার দরকার নেই। কিন্তু এখন মহুয়ার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই যে ঘেঁটে যাবে সব!
মহুয়া আবার একই প্রশ্ন করল আর সংঘমিত্রা এবার খুব রাগের সঙ্গে বলে উঠল, তোরা খালি উলটোপালটা বকে যাচ্ছিস| অনুরাগকে ওই অম্বালিকার খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনবে কে?
- ছাড়াতে গেলে তোকেই ছাড়াতে হবে| তোদের পার্সোনাল ব্যাপারে আমরা কেন ইন্টারফেয়ার করতে যাব? মহুয়া শান্ত গলায় বলল|

- তোর নিজের সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটলে তুই এরকম বলতে পারতিস? সংঘমিত্রা কান্না-ভেজা গলায় প্রশ্ন করল|
মহুয়া গুম হয়ে গেল প্রশ্নটা শুনে| আর ওই গুম হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সবার মধ্যে|
প্রতীক আলতো করে বলল, আমরা সবই চাই সাইক্লোনটা অন্য রাজ্য, অন্য দেশের উপর দিয়ে চলে যাক, তাই না?
শ্রেয়সী বলল, কিছু যদি বাঁচবে, তবে নিজের ঘরটাই বাঁচুক|
ওদের কথোপকথন কেউ শুনল না! শুনেও শুনল না!

নোবেল প্রাইজ

মধ্যিখানে ওই বিড্ডু-সঞ্জয়দের জন্য একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, কিন্তু এমনিতে বরাবরই আকাশনীলের সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক ভাল! একবার অনুরাগের থেকে একটা বই পড়তে নিয়েছিল ও| নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, এমন অনেকের জীবনী| তিন-চারদিন পরেই বইটা ফেরত দেওয়াতে অনুরাগ জিজ্ঞেস করেছিল ওর এত তাড়াতাড়ি বইটা পড়া হয়ে গেল কী করে| ওদের সামনে দিয়ে তখন রিকশায় চেপে একটা দারুণ দেখতে মেয়ে পাস করে যাচ্ছে| আকাশনীল সেদিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার কাছে নোবেল প্রাইজ পাওয়া হচ্ছে এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা, মেয়েটার হাত ধরে হাঁটা| আজ যখন সিনেমাহলের সামনে ওর আর অম্বালিকার সঙ্গে অনুরাগের হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল, আকাশনীলের একবার ইচ্ছে হল হাত বাড়িয়ে অম্বালিকার হাতটা ছোঁয়। অনুরাগকে দেখিয়ে ওর সঙ্গে এক-দু'পা হাঁটে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে ও জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে?
- ও আবার কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই কোনও লাইব্রেরি-টাইব্রেরি থেকে ফিরছে। অম্বালিকা বলল।
অনুরাগ কোনও জবাব না দিয়ে হাসল|
আর আকাশনীলকে কিছুটা চমকে দিয়ে অম্বালিকা অনুরাগকে জিজ্ঞেস করল, আমার মেসেজটার জবাব কখন পাব?
- যখন সময় হবে। কথাটা বলে অনুরাগ ওদের ছেড়ে এগিয়ে গেল |

হলে ঢুকতে-ঢুকতে, হলে ঢুকে অম্বালিকার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়েও আকাশনীলের বারবার মনে হচ্ছিল, কী মেসেজ পাঠিয়েছে অম্বালিকা? কোন মেসেজের জবাব চাইছে ও অনুরাগের থেকে?
- মাল্টিপ্লেক্স ছাড়া এখন আর সিনেমা দেখতে পারি না| ভীষণ আনকমফর্টেবল লাগে। অম্বালিকা পাঁচ মিনিট অন্তর বলছিল|
ইন্টারভ্যালের পরপরই ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আকাশনীল| অম্বালিকা বলল, আজ খুব টায়ার্ড লাগছে জানিস তো! দুপুরে অতক্ষণ মিছিলে হেঁটেছি| অভ্যেস নেই না?
আকাশনীল বলল, আমি ট্যাক্সি ডাকছি|
- ছেড়ে দে, আমি অটো করেই বাড়ি চলে যাই বরং|
আকাশনীল বলার চেষ্টা করল ওর অত ঝামেলা করে নেওয়া ছুটি, ওদের একসঙ্গে রাতে রেস্তোরায় খাওয়ার প্ল্যান কিন্তু কিছুই বলতে পারল না| বলতে না পেরে ও ফেরার পথে সামনে পেয়ে গেল অনেকটা অন্ধকার| ওর আঙুলের তারে বেজে ওঠা অম্বালিকার আঙুল|
শ্যাম্পু করা চুলের ভিতর থেকে যে গন্ধটা এসে আছড়ে পড়ছিল ওর উপর, আকাশনীলের মনে হচ্ছিল, সেই গন্ধটা ও সদ্য উনুন থেকে নামানো বিরিয়ানির ভিতরেও পেয়েছে| গন্ধের উৎসটাকে বাঁ হাতের মুঠো দিয়ে সরানোর সময় অম্বালিকা মোবাইলটা খুটুর-খুটুর করছিল| আকাশনীল ওর মুখটা ডান হাতের তালু দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরার সময় অম্বালিকা বলল, বদ কোথাকার|

- কে আমি? জানি তো। আকাশনীল হাসল|
- না, তুই কেন হবি! রাজীব মেহেরোত্রা। অম্বালিকা বলল|
- রাজীব মেহেরোত্রা? সে কে?
- আমাদের ডেপুটি ম্যানেজার, অপারেশন্স| ড্রাঙ্ক অবস্থায় আমাকে জড়িয়ে ধরে কিস করল| আমি চুপচাপ হজম করে নিলাম। আর এখন আমার চাকরি গেছে বলে ফোন করলেও ধরছে না|
আকাশনীলের মনে হল ওর মাথায় কেউ একটা আধলা ইট মারল| ও কোনওমতে বলল, তুই প্রোটেস্ট করলি না একবার?
- বাবা অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছে রে আমার পিছনে! আমি কোনও ব্যাপার নিয়ে কেস করে চাকরির জায়গায় জটিলতা বাড়াতে চাইছিলাম না| কিন্তু দ্যাখ শেষ পর্যন্ত সেই ...

আকাশনীল চুপ করে রইল| অম্বালিকাও কথা বলছিল না| রাতের একটা নক্ষত্র গুটিগুটি হেঁটে যাচ্ছিল আর একটা নক্ষত্রের দিকে| অম্বালিকার খোলা চুল, অল্প খোলা ঠোঁট, আকাশনীল বুঝতে পারছিল, নোবেল প্রাইজ ওর সামনেই| কিন্তু আজ আর ও নোবেল প্রাইজটা নিতে পারবে না| কিছুতেই না|

সেই তো আবার

“আমার আর চাকরি নেই| আমাকে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করতে হবে| তোমার হেল্প ছাড়া আমি এক পা'ও এগোতে পারব না| তুমি হেল্প করবে তো আমায়?”
অনুরাগ মেসেজটা পড়ল| দু'বার, তিনবার| গতকালের মেসেজ| তারপর পড়তে শুরু করল অম্বালিকার আজ সকালে পাঠানো মেসেজটা|
"উপস! আপাতত আর পড়াশোনার দরকার নেই| আমি আমার চাকরিটা ফেরত পেয়েছি| ইন ফিউচার কখনও কোনও দরকার হলে তোমায় নিশ্চয়ই জানাব। টেক কেয়ার।”
দুটো মেসেজি ডিলিট করার আগে অনুরাগ পাঁচ সেকেন্ড থমকাল| ভাবল, সংঘমিত্রাকে একবার দেখিয়ে নেবে কি না! কাল রাতে খুব কাঁদছিল মেয়েটা| ভয়ের কান্না| সেই ভয়টা ভেঙে দিলে ভাল হয় না? কিন্তু ওর মন বলল, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মুখ যখন ঘন হয়ে আসে, তখন ওই দু'টো মুখের একটাই ছায়া পড়ে| কিন্তু সেই ছায়াটা দু'টো মুখের থেকে আলাদা কিছু| সম্পর্কের থেকে সম্পর্কের ধারণা যেমন আলাদা| ওটা আলাদা হয়েই থাক! ওটাকে রোদ্দুর দিয়ে ক্ল্যারিফাই করা ঠিক হবে না|
মেসেজ দুটো ডিলিট করে দিল অনুরাগ |

সকালে উঠে বেশ কিছুটা ঝরঝরেই লাগছিল আকাশনীলের| কাল রাত বারোটা নাগাদ ওকে ফোন করেছিল অম্বালিকা| বলেছিল যে, ও একটু আগে ওই রাজীব মেহেরোত্রার এসএমএস পেয়েছে| ওদের এয়ারলাইন্সে যাদের চাকরি গিয়েছিল, তারা সবাই চাকরি ফেরত পাচ্ছে| একটু পরেই টিভিতে ব্রেকিং নিউজ আসবে|
আকাশনীল শুধু বলল, কনগ্র্যাটস!
অম্বালিকা বলল, থ্যাঙ্কস! কিন্তু মাইনে বোধহয় অনেকটা কমিয়ে দেবে রে! তোকে আমার যে সিভি.-টা দিয়ে এসেছি, সেটার কথা একটু মাথায় রাখিস| বড় কোনও হোটেল হলে তোর সঙ্গে আমিও ইন্টারভিউ দেব| তারপর যারটা লাগে|

ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক আকাশনীলের মনে হচ্ছিল, কী একটা যেন বাকি থেকে গিয়েছে। ও চোখ বন্ধ করে বলল, জীবনের সর্বত্র, সব সময় আমার আগে তোরটা লাগুক। বলার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের ঝরঝরে ভাবটা বেড়ে গেল আরও| ও চেঁচিয়ে ব্রেকফাস্ট চাইল মায়ের কাছে|

কালরাতে উত্তেজনায় ভাল ঘুম হয়নি জিকোর| উত্তেজনা কারণ, অম্বালিকা ওর সঙ্গে ওর নেতাদের ঘরে ঢোকায় জিকোর কদর বেড়ে গিয়েছে| সুখবরটা যখন ও টিভিতে দেখে, তখন রাত দেড়টা| তখন তো আর ফোন করা যায় না! তাই সকাল হতেই ও ফোন লাগালো অম্বালিকাকে| বেশ খানিকক্ষণ কসরতের পর লাইন পেল।
- কী রে আমাদের বিজয় মিছিলে আজ আসছিস তো? আই মিন তোদের বিজয় মিছিলে?
- খেপেছ? আমি এখন রেডি হচ্ছি| আমার আজ দুপুরের ডিউটিতে রিপোর্ট করতে হবে। অম্বালিকা বলল|
ডাকু ভোরের কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল, জিকো জেগে বসে আছে| ও চোখের ইশারায় জানতে চাইল, কী ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি?
জিকো গম্ভীর মুখে বলল, আচ্ছা ডাকু, আমার সঙ্গে কথা বলে তোর কি কখনও মনে হয়, আমি খেপে গেছি?
ডাকু ধাক্কা দিয়ে জানলাটা খুলতে-খুলতে বলল, চাকরি ফেরত পাওয়ার আনন্দে পাগল হয়ে গিয়ে তোমাকে পাগল বলেছে| ওতে রাগ করে না গো, ওইটুকুতে রাগ করতে নেই|

পরিশিষ্ট

গল্প থেকে বেরিয়ে এলে গল্পের চরিত্রদের আর চিনতে নেই! কিন্তু রাস্তায়, ফুটপাথে, বাস-অটোর লাইনে, ক্লাবের চাতালে, কোচিং সেন্টারের বারান্দায় ওদের না চিনে আমার উপায় থাকে না! কানে আসে জটলার মধ্যে ওদের একজন আর একজনকে বলছে, আচ্ছা ওই যে প্লেনটা অত উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, ওর ভিতর থেকে নিচের লোকজন, ঘরবাড়ি সবকিছুকে খুব ছোট লাগে তাই না?
যাকে বলা হল, সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে| তারপর বলে, তোর কি মনে হয় চাঁদটা আদতে ওইটুকু? নিচ থেকে দেখলে উপরের জিনিসগুলোকেও ছোটই লাগে|

কথাটা শুনে আমার খুব ইচ্ছে করে একটা বাহবা দিই! কিন্তু বাহবা দিতে গেলেই ওদের গল্পটার ভিতর আমাকে ঢুকতে হবে| সেটা ঠিক হবে কি?

চেনা মেয়ের জানা কথা

শ্যামলী আচার্য

পর পর তিনটি দোকান। তিনটিই মুদিখানা। আজকাল পোশাকি ভাষায় আমরা বলি গ্রসারি। কিন্তু ছোট্ট পাড়ার মধ্যে দোকানগুলো আগে তেমন চোখে পড়ত না। অল্প আলো, কম জিনিসপত্র, ম্রিয়মাণ বিক্রেতা নিয়ে টিমটিম করে চলত। করোনা-কালে যখন সব ওলটপালট, লকডাউনের চোখরাঙানির সময় পাড়ার ছোট্ট দোকানগুলোই তখন লাইফলাইন। সেই সময় দেখলাম এক আশ্চর্য পরিবর্তন। দোকানগুলোতে এতদিনের অগোছালো ভাবটা কমে যাচ্ছে, একটু বেশি পরিচ্ছন্ন, একটু যত্ন করে সাজানো, আর যেন আরও একটু বেশি চটপট পাওয়া যাচ্ছে সব জিনিস। ফারাকের কারণ ক'দিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। বাবার কিংবা স্বামীর দোকানে এবার হাল ধরেছে মেয়ে অথবা বাড়ির বউ। পুরুষটি আছেন, ছিলেন যেমন। কিন্তু তাঁর থেকেও অনেক বেশি তৎপর মেয়েটি। কলেজে পড়ছিল, তার ক্লাস বন্ধ। অনলাইন ক্লাসের উপায় নেই। অথবা ঘরে রান্নাবান্না করেই দিন কাটছিল। এদিকে সংসারে আয়ের উৎস ওই ছোট্ট দোকানটি। সেটি সুস্থভাবে চললে বাঁচবে পুরো সংসার। অতএব, সেটির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছে বাড়ির কিশোরী মেয়েটি বা যুবতী বউটি। আর পাড়ার মধ্যে যেমন হয়; একজনের সাফল্যের নিদর্শন চটপট অনুপ্রাণিত করে আরেকজনকে। সুতরাং পাশাপাশি তিনটি দোকানের ভোল বদলে গেল রাতারাতি। স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। হাঁকডাক চেঁচামেচি নেই। শুধু হাসিমুখ, আন্তরিক ব্যবহার, পাড়ার যাবতীয় গ্রাহককে আপন করে নেওয়া আর সেইসঙ্গে কাজের দক্ষতা। নিজেদের নতুন পেশায় নিঃসংকোচে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

এই মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই কিন্তু মেয়েদের সবথেকে বড় জোরের জায়গা। যে মেয়েটি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার, তার ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়া যেমন মারাত্মক, ঠিক তেমনই আবার, যে মেয়েটি এখন অন্যরকম পেশা বেছে নিচ্ছে, তার ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও কিছু কম নয়।

পাড়ার মধ্যে মুদি দোকানের পাশাপাশি একটি পান বিড়ি-সিগারেটের দোকানেও এসে বসল যুবতী বউদি। কী এক অজ্ঞাত রসায়নে পাড়ার বখাটে ছোকরা থেকে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সকলেই তাকে ভালবাসে, সম্মান করে। এই সম্মান হয়ত নিজের সংসারের গণ্ডিতে সে কখনও আলাদা করে পায়নি। তার সব সার্ভিস বাড়িতে 'টেকন ফর গ্র্যান্টেড'। কিন্তু ফুল বিক্রি করা দিদি, মাছের বাজারে ঝড়ের গতিতে আঁশ ছাড়িয়ে যাওয়া মাসি, পানের দোকানে নিপুণ হাতে চুন-সুপুরি-খয়ের সাজিয়ে দেওয়া বউদির পাশাপাশি মেয়েরা এগিয়ে এসেছে চায়ের দোকানে, ফুচকা কিংবা ফাস্টফুডের স্টলে; সম্পূর্ণ একার চেষ্টায়, নিজস্ব ব্যবসায়। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের সদর এবং মফঃস্বল শহর এভাবেই দেখছে মধ্যবিত্ত মেয়েদের। এও এক জাগরণ বইকি।

বিকল্প কর্মসংস্থানের নতুন পথ নিয়ে এখন মেয়েরাই এগিয়ে আসছে মাথা উঁচু করে। সুইগি জোম্যাটোর ডেলিভারি করার জন্য স্কুটিতে চেপে কাঁধে বিরাট ঝোলা নিয়ে অক্লেশে পাড়ি দিচ্ছে মাইলের পর মাইল।

সম্প্রতি এক ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির খোঁজ পেলাম। এক যুবতী একার উদ্যোগে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে বই। সামান্য মাসিক চাঁদা। পছন্দের বইটি তাকে হোয়্যাটসঅ্যাপ করে দিলে যথাসময়ে হাসিমুখে সে বইটি বাড়িতে এসে দিয়ে যাবে। গ্র্যাজুয়েট হয়ে ঘরে বসে দিনগত পাপক্ষয় না করে মেয়েরা এখন ঝটপট বেছে নিচ্ছে যে কোনও রকম কাজ।

অথচ ভাবলে অবাক লাগে, কন্যাজন্মের কত অভিশাপকেই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে সমাজ। সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, গৌরীদান, কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েকে পাত্রস্থ করার তাড়াহুড়ো, কৌলীন্যরক্ষার তাগিদে পুরুষের বহুবিবাহ, অকালবৈধব্যের যন্ত্রণা, -- একের পর এক টালমাটাল করে দেওয়া সমাজ-নির্দিষ্ট বিধিবিধান আর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা এককালে অত্যন্ত ধীরগতিতে চলেছে। কাজেই নতুন পেশা মানেই তো আর নিশ্চিন্ততা নয়। অনিশ্চয়তা হতে পারে। হতে পারে কোনো অন্ধকারের চোরাস্রোত। নিষিদ্ধের ইশারা। লোভ কিংবা লালসার বিষাক্ত নিঃশ্বাস থাকাও অস্বাভাবিক নয়। শেষ পর্যন্ত জীবনটা যে মেয়েমানুষের। নারীমাংসের।

একটা সময় ছিল, যখন কোনও কোনও মেয়েদের জন্য ঈশ্বর শেষ আশ্রয়। কখনও লৌকিক, কখনও পৌরাণিক। কিছু বিশ্বাসে মিলায়। কিছু তর্কে। কেউ পাথরের কাছে, কেউ মাটির মূর্তিতে। কোনো এক সময়, কোনো একদিন, কোনো বিশেষ মুহূর্তে, দিনের শুরুতে হোক বা দিনান্তবেলায় কোথাও না কোথাও থাকেই আত্মনিবেদন। নিজের কান্নাটুকু ঢেলে দেবার জন্য, না-বলা কথা উজাড় করার তাগিদে, হয়ত সেইটুকুই শেষ আশ্রয়। মনস্তত্ত্ববিদ বলবেন, সেই ক্যাথারসিস, সেই ভরসা, সেই আত্মসমর্পণ এক ধরণের স্ট্রেস কমানোর দাওয়াই। নিজের মনের সবটুকু, সব জ্বালা-যন্ত্রণা, কামনা-বাসনা, ভালবাসা-ঘৃণা দুর্ভাগ্য বঞ্চনা অপ্রাপ্তি সব কিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে এক চিলতে ঠাকুরঘরে কিংবা ঠাকুরের সাজানো আসনে, এক বা একাধিক বিগ্রহের কাছে কিছুক্ষণ অন্তত নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ। নিত্যপুজায় সেজন্য কখনো মন্ত্র, কখনো শুধুই 'সুভালাভালি'র শব্দ।

তিথি নক্ষত্র পঞ্জিকা মেনে ব্রতপালন। বিপদে আপদে সম্পদে সুতো বেঁধে, পাথরের টুকরো ঝুলিয়ে, গলায় কাঁখে তাবিজ কবচ শিকড় মাদুলির স্পর্শে, উপবাসে অনুষ্ঠানে আচারে বিচারে কামনা বাসনার নিবেদন। আমার যে সব দিতে হবে। সমস্ত কিছুই। এমনকি যা আমার নয়, তা'ও। দিনে, সপ্তাহে, মাসে, বছরে, পলে-অনুপলে , যুগে যুগে, কালে কালে, পালা-পার্বণে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সকলের কল্যাণ কামনায় একটির পর একটি নমস্কার। আভূমি প্রণত হয়ে, জোড়হাতের স্তবে, ফুল-বেলপাতা প্রদীপের শিখা, ধূপ ধুনো ধোঁয়ার উপচারে। অমঙ্গল মোছার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। বিনা আয়াসে শুধু প্রার্থনা।

মনে পড়ে, হস্তিনাপুরের ভরা সভায় পাশাখেলায় বসেছেন দুই পক্ষ। পাণ্ডব আর কৌরব। দুই প্রতিপক্ষ। শকুনির চক্রান্তে পাশার দানে এক মুহূর্তে ঘরের বৌ এসে দাঁড়ায় হাটের মাঝে। সেদিন সকলে মিলে তারিয়ে তারিয়ে চেখে দেখবে তার বস্ত্রহরণ পর্ব। পাঞ্চাল রাজার কন্যা, পাণ্ডব-ঘরণী রাজকূলবধূর লজ্জা নিবারণের জন্য শ্বশুর, ভাসুর, দেওর, এমনকী পাঁচ-পাঁচটি স্বামীও তো কম পড়েছিল। যজ্ঞের আগুন থেকে উৎপত্তি যে যাজ্ঞসেনীর, তিনিও ঐ বিপদে স্মরণ করেন তাঁর একান্ত নির্ভরযোগ্য সখা, বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে। তা' ছাড়া আর উপায়ই বা কী? আপনজনেরাই যখন পর। অতএব শেষ ভরসা, অন্তিম আশ্রয়। পরিত্রাণ তিনিই করবেন। তিনিই তো ঈশ্বর, যিনি এগিয়ে আসেন বিপন্ন মানুষের সাহায্যে। হিরোসুলভ মাচো ইমেজ বা বাহুবলীসুলভ লম্ফঝম্প প্রয়োজন কিসের। দ্রৌপদীর লজ্জাবস্ত্রের অফুরান জোগান দেওয়া তো নিতান্ত উপলক্ষ্য মাত্র। মহাভারতের কাহিনীকার এই মারাত্মক ঘটনার চিত্রকল্পে যেন কোথায় দাগিয়ে দিলেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কেমন হবে মেয়েদের ঈশ্বর। কেমন হওয়া উচিত তার। মহাকাব্যের অন্যতমা নায়িকা কৃষ্ণার প্রতি যে অবিচার আর লাঞ্ছনা -- তার প্রতিকার করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আর তো কোন মানুষ উঠে দাঁড়াল না। প্রতিবাদের আওয়াজও তেমন টের পাওয়া গেল না। অতএব, হা কৃষ্ণ। শ্রীরাধিকা থেকে মীরাবাঈ, সকলের রক্ষাকর্তা আরাধ্য হয়ে তামাম মহিলাকূলে ঠাঁই করে নিলেন সেই বংশীধারী। তিল তুলসী দিয়ে এই দেহ তাঁকে সমর্পণ না করে আর রক্ষা আছে?

তুমি বাপু বাপ-মায়ের বাধ্য সন্তান। রাজপুত্র হয়ে জন্মেছ। পিতৃসত্য পালনে তুমি পুরুষমানুষ, তুমি বনবাসী হতেই পারো। তা'ও এক-আধ বছর নয়। চোদ্দ বছর। কিন্তু সঙ্গে পতিব্রতা স্ত্রী না গেলে চলবে কেন? এ যেন বিধিনির্দিষ্ট। পঞ্চসতীর তালিকায় নাম তুলতে হবে না! অথচ বিপদসংকুল বনে-জঙ্গলে জনক রাজার মেয়ে, রঘুবংশের মতো খ্যাতিমান রাজপরিবারের ঘরণীর জন্য বডিগার্ড শুধু দেওরটি। তার যদি দেখাশোনার কাজে হয় সামান্য ভুলচুক, গাফিলতি, তবে তিথি নক্ষত্র পঞ্জিকা মেনে ব্রতপালন। বিপদে আপদে সম্পদে সুতো বেঁধে, পাথরের টুকরো ঝুলিয়ে, গলায় কাঁখে তাবিজ কবচ শিকড় মাদুলির স্পর্শে, উপবাসে অনুষ্ঠানে আচারে বিচারে কামনা বাসনার নিবেদন। আমার যে সব দিতে হবে। সমস্ত কিছুই। এমনকি যা আমার নয়, তা'ও।

দিনে, সপ্তাহে, মাসে, বছরে, পলে-অনুপলে , যুগে যুগে, কালে কালে, পালা-পার্বণে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সকলের কল্যাণ কামনায় একটির পর একটি নমস্কার। আভূমি প্রণত হয়ে, জোড়হাতের স্তবে, ফুল-বেলপাতা প্রদীপের শিখা, ধূপ ধুনো ধোঁয়ার উপচারে। অমঙ্গল মোছার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। বিনা আয়াসে শুধু প্রার্থনা।

খেসারত দেবেন তো জানকী স্বয়ং।পুষ্পকরথ তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে সাগরপারের শ্রীলংকায়। রাবণের রাজত্বে তুমি অশোকবনে থেকেছ, না দশাননের অন্দরমহলে — সে সত্য আর কে কবে যাচাই করতে গেছে! পরপুরুষের ঘরে এতগুলো বছর কাটিয়ে আসা কি চাট্টিখানি কথা! অতএব তাকেই পুরোদস্তুর প্রমাণ দিতে হবে জনসমক্ষে, দেখাও দেখি তোমার কেমন সতীত্ব। ঝাঁপ দাও দেখি আগুনে! পুড়লে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। 'কথায় আছে, ভাগ্যবানের বৌ মরে,' তা' সে কইমাছের জান। এত সহজে যায়? কাজেই একবার নয়। আবার। প্রয়োজনে বার বার। যতদিন না তার আকুল প্রার্থনায় ধরিত্রী বিদীর্ণ হয়। ধরিত্রী কর্ণপাত না করলে জহরব্রত তো আছেই। নারীর সম্ভ্রমরক্ষার একমাত্র সহজতম উপায়। একা যে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? দল বেঁধেই যাও না হয়। ইজ্জত বাঁচাতে ঘোর কলিযুগে আগুনের কাছে সমর্পণ করা ছাড়া আর যেন কোনো সহজ রাস্তাই নেই। ভাগ্যিস লক্ষ্মীবাঈ কঠিন রাস্তায় হাঁটলেন। সুলতানা রিজিয়া যতটুকু অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, সেই পথে আরো একটু যেন এগিয়ে গেলেন ঝাঁসির রানি। নিজের হাতের শাণিত অস্ত্রই তাঁর একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর।

ভারতে শিশুকন্যা হত্যার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল একদিকে পূর্ব সীমান্তের নাগাভূমি থেকে পশ্চিম সীমান্তের কচ্ছ পর্যন্ত; অন্যদিকে মধ্যাঞ্চল থেকে উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত। ধরিত্রী দেবীকে তুষ্ট করার জন্য উড়িষ্যা-অন্ধ্র অঞ্চলে চলত শিশুবলি। কোনো ধর্মীয় বা দৈবিক বিধান নয়। কন্যার বিবাহের সম্ভাব্য সংকট থেকে সহজে পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আরো মর্মান্তিক হল, অনেক ক্ষেত্রে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে বিষ খাইয়ে বা গলা টিপে হয়া করত স্বয়ং জন্মদাত্রী। কোনো কোনো জায়গায় নবজাত কন্যাকে ফেলে দেওয়া হত গভীর জঙ্গলে বা ঝর্নার জলে। কোথাও পুঁতে ফেলা হত ঘরের দাওয়াতেই। কোথাও আবার দুধ ভর্তি পাত্রে শিশুকন্যাকে ডুবিয়ে.....। কোনো কোনো অঞ্চলে নবজাতিকার মুখে ঢেলে দেওয়া হত ধুতুরা, আকন্দ বা মাদারের বিষাক্ত রস। নিষ্ঠুর, বীভৎস, অমানবিক প্রথা। সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরোধী। শাস্ত্রে বরং নারী বা শিশুহত্যাকে মহাপাপ বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, 'বিপ্রহত্যা সমং পাপং স্ত্রীবধে লভতে নরঃ।' নারীবধে মানুষ ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপভাগী হয়। অথচ, কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রথা নিঃশব্দে চলেছে ভারতের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। একমাত্র মানবোচিত ব্যতিক্রম ছিল দাক্ষিণাত্য। অর্থাৎ সমস্ত আর্যাবর্ত ধরে চলেছে এই গণহারে শিশুকন্যা হত্যা।

সমাজ তো শুধুই ঘরের মেয়েদের উদ্দেশ্যে তর্জনী তোলেনি। চোখ রাঙিয়েছিল তাদের দিকেও, যারা নিরুপায় হয়ে পঙ্কিল অসামাজিক পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। একবারও কেউ ভেবে দেখেনি তাদের ঐ ঘৃণিত জীবনের জন্য তারা নিজেরা সত্যিই কতটা দায়ী। এই সমস্ত গলিপথ, কাদা আর অন্ধকার, অন্দরমহলের চোখের জল থেকে বারবাড়ির ঘুঙুরের আওয়াজের আড়ালে লুকিয়ে রাখা কান্নার শব্দ – প্রতিটি প্রেক্ষিত মেয়েমানুষকে দিনের শেষে দাঁড় করিয়ে দেয় এক এবং একমাত্র আশ্রয়ের সামনে। সে আশ্রয়ের নাম আত্মবিশ্বাস। সেই আঁধার ঘরের প্রদীপটুকুর নাম শিরদাঁড়া।

আজ সেই আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে সে বলীয়ান। তার আর এখন অন্য কোনও আশ্রয় প্রয়োজন হয় না।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খস খসে আজকের সংসার, দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতা আর নিয়মের নাগপাশে হাঁপিয়ে ওঠে মন। দক্ষিণ গোলার্ধে Australia তে এখন শীতকাল। বর্ষার হাত ধরে আসে হিমের পরশ। খিচুড়িরসাথে ডিমের ওমলেট, কখনো ভেজা বিকেলে পাকোড়া আর চা বানিয়ে, ফেলে আসা দিনের nostalgia তৈরী করি। পড়ন্ত দিনে সেদিন ছিল সোনালী রোদের ছোঁয়া। অঝোর জল বৃষ্টিতে ছিল এক ঘেয়েমির এক স্থুলতা। শীতের বাতাসে ফিরে এল ছেলে বেলার গল্প। প্রেম - স্বপ্ন - মেয়েবেলাটুকু ফিরে এল এক পলকে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন, কেমন যেন ঠান্ডা হাওয়া চারিদিকে। সে, আমার থেকে মাত্র আড়াই বছরের বড়ো, অথচ তার দোর্দন্ড প্রতাপ, আমার দাদা।

কাগজের নৌকো বানানোতে ভারী এক্সপার্ট। নিমেষে বানিয়ে দেয়া, তা সে ইংরেজি বা বাংলা যে কোনো দৈনিক কাগজই হোক না কেন, কিংবা মিষ্টির প্যাকেট, রঙিন কাগজ, ম্যাগাজিনের ছেঁড়া পাতা, mattered little। চোখের পলকে, ফুস মন্তরের জাদুতে কাগজ হয়ে যেত নৌকো।

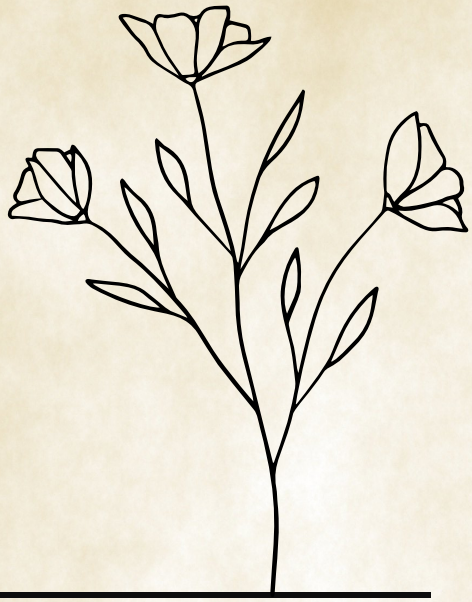

তখনো কোমল নীলাভ আলো চারিদিকটা একটা আমেজে আবিষ্ট করে রেখেছে। চুপিচুপি ছাদে গিয়ে জল যাওয়ার মুখে ইটের টুকরো সযত্নে আটকে তৈরী হলো কলকাতা শহরে একান্ত আমাদের হাঁটু জল দীঘি। দীঘির কালো জলে ভেসে বেড়ালো অজস্র নৌকো। সাদা কালো অক্ষরের কাগজে কোনোটা, আবার কিছু মিষ্টির রসে ভেজা নকুড় ঘোষের মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে তৈরী, সেলোফিন পেপার দিয়েও তৈরী হলো আরো বিশেষ কিছু, জলে ভিজেও তার প্রাণ থাকবে আরো একটু বেশি সময়, এই আশায় বুক বেঁধেছি।

ঝম ঝম না হলেও, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির জলে ভাই বোন ভিজে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই আমাদের। বন্ধ দরজার কপাট আলগা করে, সবে মাত্র জেগে ওঠা সকাল, তখনো তার কচি দু চোখে লেগে আছে গত রাতের ঘুমের রেশ, শুধু যেন আমাদের কান্ড দেখবার জন্যই তার জেগে ওঠা।

সেদিন আমাদের সাজানো নৌকো দেখবার মতই, ঝাঁটার কাঠি ভেঙে, তাতে ঘুড়ির কাগজ, গদের আঠা দিয়ে লাগিয়েছি, আমাদের রঙিন পালে তখন সদ্য ভোরের আরাম আমেজ। অনেক দূরের দেশে ভেসে যাবে নৌকো। বাধ সাধলো মা। তারই সাথে অঢেল বকুনি, দাদার গালে এক আধটা থাপ্পড়, ছোটো বলে আমার ভাগ্যে একটু কম, উপরি পাওনা দুজনেরই punishment lines, রুলটানা খাতা ভরে অন্তত একশো বার লিখতে হলো - মাকে না বলে আর ছাদে যাবো না।

রাতের তারাদের সাথে স্বপ্ন দেখেছিলাম জোৎস্নার নদী পেরিয়ে নিস্তব্ধ কোনো অজানা দ্বীপে ভেসে যাব। হয়তো নৌকো ভিজে গেলে, বাড়ী ফিরবো মিথ্যে পাখায় উড়ে উড়ে। তা সে আর হলো কই?

ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা ভেবেই মনে হয় নিজের ছেলেদের সাথে করে ফিরে গেছিলাম ফেলে আসা দিনের স্মৃতির ভিড়ে। তা সেও আজ অনেক বছর হলো।

আজকে মনে পড়তেই এক চিলতে রোদের মতো হাসি মন আর মুখ জুড়ে খেলে গেল।

সেও ছিল এমনি এক জুলাই মাস। বাইরে অঝোর জল বৃষ্টি। সেদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলাম।

চাইল্ডকেয়ার থেকে বড়ো ছেলেকে তুলে, উইনটার জ্যাকেট, জুতো ছেড়ে, চটপট দৈনিক কাগজ দিয়ে তৈরী করলাম কাগজের নৌকো। ক্রাফট বক্স ঘেঁটে বেরোলো সেলোফিন পেপার, তৈরী হলো স্বচ্ছ সৌখিন নৌকো। মনের খুশিতে ব্যাক ইয়ার্ডের দরজা খুলে দেখি বেশ খানিক জল জমে আছে, ভেসে চলল কাগজের নৌকো, উত্তেজিত হয়ে ডাকলাম, ‘পরাগ, পরাগ, শিগ্গিরি আয়, দুজনে মিলে খেলবো আয়।‘

বেশ খানিক বাদে এল সে।

খালি তো পাঁচ বছরের ছেলে। পৃথিবীর মাত্র অল্প দিনের বাসিন্দা, কিন্তু মাথায় যেন এক প্রাচীন মানুষ বসে তার।

শখের হলুদ রেনকোট, কালো গামবুট আর হাতে নীল সাদা battery operated coastguard boat। আমার হাতে বানানো কাগজের নৌকো তখন ভিজে সপসপে!

ছেলে বলে, 'দাঁড়াও,' তার প্ল্যাস্টিকের স্যান্ডপিট বৃষ্টির জলে টাপুটুপু, উবু হয়ে বসে তার নৌকো খানা ছেড়ে দিল জলে, তারপর খুশী মনে দু হাতে তালি দিয়ে বলে, 'মা এ নৌকো ভিজলেও ক্ষতি নেই, চলবে যতক্ষণ চাও, আর ব্যাটারী ফুরিয়ে গেলে বাবার bedhead drawer এ আরো আছে, আরো আছে, এনে দেবো।' ইঞ্জিনের মতো শব্দ ছুটছে, ঘুরছে আমার চারপাশে, শব্দহীন এক স্তব্ধতায় আমি ভেসে যাচ্ছি।

খানিক দাঁড়িয়ে থাকলো পাশে, যেন একটু দেখে নেওয়া মা ঠিক পারবে তো, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো সে।

টিভিতে তখন ABC তে Playschool হচ্ছে – 'There's a bear in there, And a chair as well, There are people with games, and Stories to tell, and Stories to tell....'

ওর মন জুড়ে নীল পর্দা, আর পর্দা জুড়ে শুধু টিভির অনুষ্ঠান। জলা মাঠ, কল্পনার হাঁস, হিমের পরশ ছাড়িয়ে মুছে গেল আমার স্বপ্ন, বেশ তাড়াতাড়ি।

ছেলের দুটো সরল চোখে তখনো বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে, এক শতাব্দীর নীল আকাশে খুঁজছি, খুঁজে যাচ্ছি। আলোর রহস্যময় অনেক রঙের মাঝে তবু থেকে যাবে এক নিবিড় ভালোবাসা। বৃষ্টি পড়ুক এমনি সুরে,টাপুর টুপুর,ছায়াঘন কাছের মাঠে, কিংবা দূরের।

ধার করা সময়

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কিছু ব্যতিক্রম আমার জীবনে তুফান তুলেছে। জীবনের অনিবার্য অবসানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ইদানীং লক্ষ্য করছি, যাঁরা এতদিন সঙ্গে হেঁটে চলেছিলেন, যাঁদের অনেকেই কোন না কোন সময়ে তাঁদের সাহচর্যে সমৃদ্ধ করেছিলেন আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি – তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন আমাদের সহযাত্রার পথ থেকে; ঠিক যেন তারা-ভরা রাতের কালো আকাশের বুক থেকে অনন্তের খোঁজে খসে পড়ছেন উল্কা হয়ে; আর এই প্রত্যেকটি উল্কাপাত, আমার অগ্রসর-পথে বিরাট শূন্যতা তৈরি করে চলেছে!

নর্থ কার্লটনের প্রাচীন গোরস্থানের দিকে এগোতে এগোতে তাই আমার হঠাৎ মনে হল এবার কি রবিন কাকুরও উধাও হয়ে যাওয়ার সময় এসেছে? তাই কি আমাকে ডেকেছেন বিদায় জানাতে?

রবিন কাকু আমার বাবার বহুকালের বন্ধু। অনেক বছর আগে আমার বাবা, সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কোলকাতা থেকে এসে নোঙর ফেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই মেলবোর্ন শহরে।

মেলবোর্নে সেই সময়ে মধ্য-গ্রীষ্ম। একদিন দুপুরে সত্যেন্দ্র একা-একাই ট্রামে চেপে চলে গিয়েছিলেন সেন্ট কিল্‌ডা বীচে আর সেখানেই দেখা হয়ে গিয়েছিল রবিন আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে।

বীচের ওপর, বিয়রের খোলা ক্যান হাতে নিয়ে বসেছিলেন রবিন। অত লোকের মাঝে হঠাৎ নজর পড়ল ষোল-সতেরো বছরের ভিন্‌দেশী ছেলেটার দিকে। তার কোমল চোখে-মুখে অদ্ভুত সরলতার সাথে মিশেছিল সহসা দিক্‌ভ্রান্তির ত্রাস।

ওঁরা দুজনেই দক্ষ আর আনাড়ি সাঁতারুদের, এবং ছোট ছেলেমেয়েদের কোলাহল আর উল্লাস দেখছিলেন। সেই উল্লাস রবিন আর্মস্ট্রংয়ের মনের আয়নায় আর একবার তাঁর একাকিত্ব তুলে ধরেছিল। আর সত্যেন্দ্রর মনে জাগিয়ে তুলেছিল ভাল লাগার চেতনা।

কিছুক্ষণ পর, হাতে ধরা খালি বিয়র ক্যানটা বালির ওপর রেখে, রবিন আর্মস্ট্রং উঠে সত্যেন্দ্রর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “হ্যালো ইয়ঙ্গ ম্যান, হাউ আর ইউ?”

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সত্যেন্দ্র চেয়েছিলেন অপরিচিত সেই শ্বেতাঙ্গর দিকে।
হাসিমুখে রবিন আর্মস্ট্রং বলেছিলেন, "হাউ আর ইউ গোয়িং, ইয়ং ম্যান?"
- ভেরি ওয়েল, থ্যাংক্যু" গড়গড় করে আওড়ে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্র।
- রবিন আর্মস্ট্রং ইজ মাই নেম। হোয়াট'স ইওরস?" রবিন জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন।
পরিচয়ের সূত্রপাতটি এইভাবেই ঘটেছিল দুটি ভিন্ন মেরুর মানুষের। তারপর সময়ের সাথে, বর্ণ বৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য এবং বয়সের ঢের তফাৎ অনায়াসে কাটিয়ে অন্তরঙ্গতা গভীর হয়ে উঠেছিল তাঁদের।
এক সময়ে সত্যেন্দ্র বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন; স্ত্রী, পুত্রকন্যা নিয়ে তাঁর বাড়-বাড়ন্ত সংসার গড়ে উঠেছিল। ওদিকে রবিন আর্মস্ট্রং একাই থেকে গেলেন। একা এবং অবিবাহিত। কিন্তু সফল ব্যাবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন রবিন কাকু। মা লক্ষ্মীর কৃপায় ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য, খ্যাতি – সবই এসে ধরা দিয়েছিল ওঁর হাতে; শুধু একটি মনমতো সঙ্গিনীর দেখা পেলেন না কোনদিন।

বাবা চলে গিয়েছেন আজ বছর দশেক। রবিন কাকুর বাড়ি আর যাওয়া হয় না আমার। শুধু মাঝে-মধ্যে ফোনে কথাবার্ত্তা হয়। মনে হয় যেন এই বৃদ্ধ বয়সের দায়ভার ক্লান্ত করে ফেলছে রবিন কাকুকে। শরীর-গতিকও খুব ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু এখনও নিজে গাড়ি চালান। বাড়িতে গৃহপরিচারিকা আছে ফুলটাইম। রান্নাবান্না সেই করে দেয়। ব্যস, এটুকুই। তা নইলে এক্কেবারে স্বাধীন এবং স্বনির্ভর রবিনকাকু, এই বিরানব্বই বছর বয়সেও!
রবার্ট গ্রে, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং হার্ট স্পেশলিস্ট, গত ক'বছর তাঁর দেখভাল করছে। কিছুদিন আগে তার কাছেই জেনেছিলাম যে রবিন কাকুর হার্টের দু-দুটো ভাল্ব নাকি এত বছর ধরে রক্ত পাম্প করতে করতে জর্জরিত। এবার নাকি সেগুলো বদল করা দরকার। তবে রবার্ট ইতস্ততঃ ক'রছিল ওঁর বয়সের কথা ভেবে। বলেছিল, "এই বয়সে ওঁকে অপারেশনের ট্রমা দেওয়াটা বোধ করি ঠিক হবে না। তার চেয়ে লেট নেচর টেক ইট্স্ ওন কোর্স।"
আজ এখানে আসার আগে রবিন কাকু ফোনে বলেছিলেন, "প্রতি মাসে আমি এই সিমেটরিতে চলে আসি। আমার পরিবারের সবার কবর ধুয়ে দিই। তাজা ফুল দিয়ে সাজাই প্রতিটি কবর। তোমাকে সেখানেই ডাকছি আমার সঙ্গে এসে একবার দেখা ক'রতে। পারবে?"

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অবশেষে ঢুকে পড়লাম মেলবোর্ন জেনেরাল সিমেটরিতে। মোবাইলে রবিন কাকুর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী চলে এলাম ওঁর পরিবার-সদস্যদের জন্য নির্ধারিত গোরস্থানের ক্ষুদ্র পরিসরে। সেখানেই দেখা মিলে গেল। একটা টুলের ওপর বসেছিলেন তিনি। দেখলাম, পাশেই একটা বাল্তির মধ্যে রাখা তাঁর কবর পরিষ্কার করার যাবতীয় সরঞ্জাম। আওয়াজ পেয়ে চম্কে তাকালেন এবং মুহূর্ত্তে বাক্যহারা। তারপর স্বচ্ছ হাসি হেসে বললেন, "বিকাশ, তুমি অবশেষে এলে! ফাইনালি ইউ মেড ইট!"
আমিও হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"এত বড় হ'য়ে গেছ, তুমি?" রবিন কাকুর বিস্ময় কাটতেই চায় না, "শেষ যখন দেখা হয়েছিল, তোমার বাবার মৃত্যুর পরে, তুমি সবে ফার্স্ট ইয়ারের মেডিকাল
ছাত্র। আর এখন তুমি বিখ্যাত কার্ডিয়োলজিস্ট! অ্যামেজিং - হাউ টাইম ফ্লাইজ!"
ইতস্ততঃ করে ওঁর পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়ে বললাম, "আপনার জন্য কি ক'রতে পারি, বলুন?"
- দ্যাখো, আমি অনেকখানি ড্রাইভ ক'রে এই সিমেটরিতে আসি বটে মম্, ড্যাড্ আর ডেভিডকে হ্যালো বলতে, কিন্তু কথাবার্ত্তার জন্য এই জায়গা উপযুক্ত নয়। চলো একটা কফি শপে বসে কথা বলি।"

* * * * *

রাস্তায় বেরিয়ে লায়গন স্ট্রীটের ওপর একটু হেঁটে যেতেই একটা ইতালিয়ন রেস্টোরেন্ট নজরে পড়ল। ভেতরে ঢুকে, কফি আর ক্যানোলি অর্ডর দিয়ে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলাম আমরা। ওইটুকু হেঁটেই যেন ভারি ধকল গিয়েছে রবিন কাকুর দেহে। বসে খানিক হাঁপালেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, "তোমাকে কয়েকটা কথা বলার জন্যই ডেকেছিলাম। খুব জরুরি কথা।"

তখনি লক্ষ্য ক'রলাম, রবিন কাকু তাঁর বিরানব্বুই বছরের প্রাচীন শরীরটাকে কি সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদে ফিটফাট রেখেছেন। ঠিক যেমন একনিষ্ঠ কোন পূজারি তাঁর মন্দিরের আরাধ্য দেবতাকে পরম যত্নে, ভালবাসায় সাজিয়ে রাখেন।

রবিনকাকু বললেন, "ইউ নো হোয়াট – আই প্ল্যান টু সারেন্ডর মাই হার্ট ইয়েট আগেন আন্ডার দ্য সার্জেন্স্ নাইফ। আর মাত্র একবার – কয়েক বছরের জন্য যদি আমার এই জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি!

চম্‌কে উঠে বললাম, "কিন্তু রবার্ট কি বল্‌ছে? অত বড় ঝুঁকি নিতে কি রাজী ও?"

- ঝুঁকিটা মোটেই নিতে চাইছিল না মিস্টর রবার্ট গ্রে", মুচ্‌কি হেসে রবিনকাকুবললেন, "কিন্তু আমিও যে ছাড়ার পাত্র নই। ওকে বোঝালাম কেন জীবনের কাছে কয়েকটা বছর আমি ধার চাই। শুনে বলল, যদি আমি লিখে ওকে কন্‌ভিন্স করতে পারি তাহলে ভেবে দেখবে"-

- "ইউ মাস্ট মেক আ কেস" রবার্ট বলেছিল।

ধীরেসুস্থে কফিটা শেষ ক'রে রবিনকাকু তাঁর পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও। রবার্টকে দেওয়া আমার লিখিত আবেদনের কপি। এই চিঠিতে যে সেন্টিমেন্ট ব্যক্ত করেছি – আমার বিশ্বাস তুমিও বুঝবে। মর্যাদা দেবে।"

কি আর বলব! চুপ করেই রইলাম।

রবিনকাকু কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা ওঁর ক্লান্ত, বৃদ্ধ, স্তিমিত দু'চোখ জলে ভরে গেল। মুখে ফুটে উঠল অপ্রস্তুত ভাব। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে একটা টিস্যু তুলে নিয়ে অশ্রু মুছে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো, এবার ফিরে যাই। ইট্‌স্ গেটিং ডার্ক।"

- আপনি এখন সিমেটরিতে ফিরবেন?

- ফিরতেই হবে। যাওয়ার আগে আমার পরিবারকে গুড বাই বলব না?

- আশা ক'রি আজ রাতেই আবার দেড়শ' কিলোমিটর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার প্ল্যান নেই আপনার?

- আরে না। ওই রিস্ক নিতে আমার মত ভিমরতিগ্রস্ত বুড়োও নারাজ। আজ রাতটা ভিক্টোরিয়া হোটেলে কাটিয়ে কাল সকাল সকাল ফিরে যাব।

রাতে বিছানায় শুয়ে রবিনকাকুর দেওয়া খামটা খুলে ফেললাম। হাতে লেখা একটা চিঠি। হার্ট সার্জন রবার্ট গ্রেকে লেখা এবং আমাকে কপি করা। রবিনকাকু লিখছেন,

'প্রিয় রবার্ট, সম্প্রতি তুমি আমার হৃদয়ের গতিবিধি পরীক্ষা ও বিশ্লেষন ক'রে বলেছিলে আমার হার্টের চারটি ভাল্ভের মধ্যে দুটি অচল হয়ে গিয়েছে এবং তৃতীয় ভাল্ভটিও নাকি বেগড়বাই করছে। অবস্থা খুব সিরিয়স। যে কোন সময়ে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। অথচ তুমি কোন রকম ইন্‌ভেসিভ সার্জারির বিরুদ্ধে। বিরানব্বুই বছরের প্রাচীন আমার এই হার্ট সার্জারির ধকল নিতে পারবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ তোমার।

সেই সূত্রেই আমার অসমাপ্ত কয়েকটি প্রজেক্টের কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম। আর বলেছিলাম যে অসমাপ্ত সেই প্রজেক্টগুলো ফেলে রেখে গেলে মরেও শান্তি পাব না।

শুনে-টুনে তুমি বললে অত বড় ঝুঁকি নেবার স্বপক্ষে যদি একটা কেস তৈরি করে তোমাকে কন্‌ভিন্স করতে পারি তাহলেই তুমি সিদ্ধান্ত নেবে। তাই, আমাকে আরও কয়েকটা বছর বাঁচিয়ে রাখার আর্জি জানিয়ে তোমাকে এই চিঠি। . . '

সহসা বালিশের তলা থেকে মোবাইলের চীৎকার শোনা গেল। ফোনটা তুলে নিলাম। ওপার থেকে হার্ট সার্জন মিস্টার রবার্ট গ্রের গলা শোনা গলা, "তোমাকে ফোন করতে একটু দেরি করে ফেললাম, বন্ধু, সরি।"

- কি ব্যাপার?
- ব্যাপার এই যে তোমার আঙ্কল রবিন আগামী কাল আমাদের এপ্ওয়ার্থ হস্পিটলে ভর্ত্তি হবেন। ওঁর আয়োটিক ভাল্ভ রিপ্লেসমেন্ট হবে।
- কি আশ্চর্য!
- আশ্চর্য কেন? হী ইজ ইন আ প্রেটি ব্যাড শেপ। যে কোন সময়ে . .”
- তুমি ওঁর চিঠিটা পড়েছ?
- হ্যাঁ, পড়েছি। ওঁর কেসে মেরিট আছে। তাই ওঁকে আরও কয়েকটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে দ্বিধা নেই আমার।
- ডেস্পাইট হিজ এজ?
- ইয়েস, ডেস্পাইট হিজ এজ। ঝুঁকিটা নিতে প্রস্তুত উনি। আমিও।

* * * * *

অপারেশনের পর এপ্ওয়ার্থ হস্পিটালের ইন্টেন্সিভ কেয়র ইউনিট থেকে রবার্ট ফোন করে আমাকে জানাল, “তোমার রবিন কাকুর অদম্য উইল পাওয়ার। তার সঙ্গে মিশে আছে ডেডিকেশন ও কমিটমেন্ট। তাই অত কঠিন, অতক্ষণব্যাপী একটা অপরেশনের সঙ্গে অনায়াসে মোকাবিলা করে তিনি জেগে উঠেছেন।”
জিজ্ঞেস করলাম, “ক’বছরের বোনস পেলেন তিনি?”
- তিন থেকে চার বছর ম্যাক্সিমম্। এই বাড়তি সময়টুকুর মধ্যে কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারবেন বলে আশা ওঁর।

* * * * *

দীর্ঘ জীবন-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং বিষয়বুদ্ধির জোরে রবিনকাকু গড়ে তুলেছিলেন ধন-সম্পদের একটি মাঝারি সাইজের সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলোয় অস্ট্রেলিয়ার ইকনমির দারুন ডিপ্রেসনের দিনগুলোও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বালক বয়সে। শিক্ষাও পেয়েছিলেন সেই সময়ের মানুষগুলোর দীন, সংকটময় ও সংঘর্ষক্লান্ত জীবনের হালচাল দেখে। তাই খুব সাদামাঠা, বিলাস-বর্জিত অথচ শৃংখলাবদ্ধ একটা জীবন-শৈলি তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজের জন্য।
কষ্টে উপার্জিত এবং সতর্ক সাবধানতায় সঞ্চিত হাজার হাজার ডলার একসময়ে তিনি দান করতে আরম্ভ ক’রলেন নানা চ্যারিটি সংস্থানের সূত্র ধরে। মেলবোর্ন থেকে একশ’ চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ওঁর ছোট্ট শহরের আশেপাশে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম কোনটাই বাদ গেল না রবিনকাকুর বদান্যতার তালিকা থেকে।
এরপর তিনি তাঁর অটিস্টিক ভাইঝি সোফি অস্টিনের নামে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গড়ে তুললেন। নাম দিলেন সোফি ট্রাস্ট ফান্ড। অতঃপর যাবতীয়
সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে প্রতি বছর পাওয়া সুদের মোটা অঙ্ক থেকেই অনায়াসে বহন করা সম্ভব হ’য়েছিল রবিনকাকুর যত চ্যারিটির খরচ।

* * * * *

সার্জারির ধাক্কাটা মাস কয়েকের মধ্যে সামলে উঠেই মহা উৎসাহে লেগে পড়লেন রবিনকাকু তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ ক’রতে।
খুব শীঘ্র, অটিস্টিক ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্পেশাল স্কুলের গোড়াপত্তন হ’ল রবিনকাকুদের শহরতলীতে। তিন থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য এটি ছিল এক মহৎ প্রচেষ্টা।
এক বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে এবং “সোফি অস্টিন স্কুল ফর অটিস্ম”- এর কাজও শেষ হ’য়ে এলো। আরম্ভ হল দ্বিতীয় প্রজেক্ট। রবিনকাকুদের বাড়ির খুব কাছে তাঁর পরিবারের উপসনাগার – গ্রে স্ট্রীট অ্যাংলিকন প্যারিশ চর্চ, যেখানে ছয় মাস বয়সে তাঁর খ্রীষ্টধর্মীকরণ (Christening) হয়েছিল। বহু বছর ধরে এই চর্চের কথা মাথায় থাকাসত্ত্বেও নানা

পরিস্থিতির কারণে এযাবৎ কিছু করা যায় নি। প্রায় দেড়শ বছর পুরাতন সেই চর্চকে এবার সম্পূর্ণ নতুন সাজে সাজিয়ে দেবার তোড়জোড় আরম্ভ হল।

প্রায় একই সঙ্গে স্থানীয় গোরস্থানকে কেন্দ্র করে তৃতীয় প্রজেক্টে হাত দিলেন তিনি। অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থা পুরাতন সেই গোরস্থলের। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, কতশত ঝড়-ঝাপ্টা, রোদ-বৃষ্টি এবং সদা-পরিবর্তনশীল মরশুমের সঙ্গে ক্রমাগত মোকাবিলা করার ফলে গোরগুলোর শোচনীয় অবস্থা। কোনটা ভেঙ্গে পড়েছে, কোনটাতে খসে পড়েছে গ্র্যানাইটের টুম্বস্টোন আবার কোথাও বা মাটির ওপর গোরস্থানের পাথরের গায়ে গজিয়ে ওঠা আগাছারা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুলছে। চারিধারের বাগানের অবস্থাও খুব ভাল না।

যদিও রবিনকাকুর পরিবারের সকলেই মেলবোর্ন শহরের দামী সিমেটরিতে নিদ্রামগ্ন, এবং সেখানেই তাঁর জন্যও অপেক্ষা ক'রছে একটি আশ্রয়, নিজের শহরতলীর পুরানো গোরস্থানের প্রতিও যে ওঁর একটা দায়িত্ব আছে, সেটা তিনি ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি যে, এই গোরস্থলে নিশ্চিন্ত শয্যায় শুয়ে আছে ওঁর ছোটবেলাকার বন্ধু স্যাম, দশ বছর বয়সে যাকে ক্যান্সার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মায়ের কোল থেকে। আছে আন্টি মার্গো, যার বিখ্যাত এবং সর্বজনবিদিত নানা রকম কেক, সসেজ রোল আর পার্টি পাই এবং রোস্ট দীর্ঘকাল রবিনকাকুর ঘরোয়া পার্টিগুলোয় ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে আন্টি মার্গোর। আছেন মিস্টার জেম্স, রবিনকাকুর প্রাইমরি স্কুল শিক্ষক।

গোরস্থান-সংশোধনের কাজও প্রায় শেষ।

তখনি, এক সন্ধ্যায় রবিনকাকুর ফোন এলো –

- গুড ইভনিং, আঙ্কল রবিন, কেমন আছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

- খুব ভাল আছি। কুডন'ট হ্যাভ বীন বেটার", রবিনকাকুর কন্ঠস্বরে উদ্দাম উচ্ছ্বাস, "তোমাকে আর আমার সার্জন রবার্টকে একসঙ্গে ডিনারে আমন্ত্রণ করতে চাই। আসতে পারবে তো?"

- নিশ্চয়ই ইট উড বী আ প্লেজার্। কিন্তু আপনার প্রজেক্টগুলো কদ্দূর?

- তিনটি প্রজেক্টই এখন সমাপ্তির খুব কাছে। একেবারে বিন্দাস। তুমি একদিন চলে এসো। সব দেখেশুনে মতামত দেবে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "রবার্টের কাছ থেকে বাড়তি সময় যেটুকু পেয়েছিলাম, তার প্রতিটি সেকেন্ডের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি। আর কোন পিছুটান নেই আমার। আই অ্যাম ফ্রী টু গো – এনি টাইম।"

* * * * *

সেই সন্ধ্যায় রবিনকাকুর সঙ্গে আমার শেষ আলাপন। দেখাও হয় নি আর। ডিনরের প্রস্তাবটিও বাতিল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ওঁর গোরস্থান প্রজেক্ট শেষ হবার মাসখানেকের মধ্যে রবার্ট গ্রের ফোন পেলাম একদিন; বলল, "বিকাশ, আই হ্যাভ নিউস।"

বললাম, "গুড নিউস অর ব্যাড নিউস?"

ফোনের ওপারে রবার্ট ইতস্ততঃ করল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "আই গেস্, বোথ। সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ – দু'টোই। কোন্টা আগে শুনবে?"

- দুঃসংবাদ! কি?

- একটু আগে মিস্টার রবিন আর্মস্ট্রং-এর হাউসকীপার ফোনে জানালেন যে গতরাতে রবিন মারা গিয়েছেন। ঘুমের মধ্যেই – ভারি শান্তিতে।

নিস্তব্ধতায় কেটে গেল কয়েকটা মিনিট।

- আর সুসংবাদ হ'ল, রবিন আর্মস্ট্রং যে উদ্দেশ্যে কয়েকটা বছর ধার করে নিয়েছিলেন বিধাতার কাছ থেকে – তাঁর সেই সকল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ করে গেলেন। হী ডিড নট্ লীভ এনি অফ্ হিজ প্রজেক্ট্স্ ইন্‌কম্প্লিট।

* * * * *

আরও অনেকের মত, ওঁর কাছ থেকে চিরবিদায় নেব বলে আমিও হাজির হয়েছিলাম সিমেটরিতে।
রবিনকাকু একবার আমাকে বলেছিলেন, "*Since the day of my birth, my death began its walk. It is walking towards me, without hurrying.*"
আমার স্থির বিশ্বাস মরণের সঙ্গে সমঝোতাটা তিনি ভালই ঘটিয়েছিলেন। তাই, বিধাতার কাছ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বাড়তি কয়েকটা বছর ধার ক'রে নেওয়া অথবা নিজের সকল দায়িত্ব চুকিয়ে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও রবিনকাকুর বিরুদ্ধে আমাদের কারোরই অভিযোগের অবকাশ রইল না।

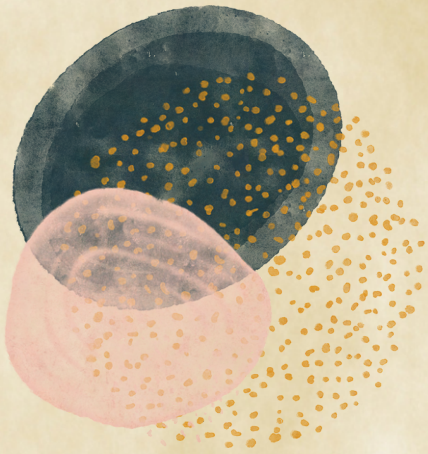

যুক্তি শেষে

শাশ্বতী বসু

- মা আমি বেরোচ্ছি, ফিরতে রাত হবে। ঠিক আছে তো? হাতঘড়ির স্ট্র্যাপটা বাঁধতে বাঁধতে মঞ্জুলিকা বলে। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে মঞ্জুলিকা এবার গলা তোলে।
- মা আমি বেরোচ্ছি।
তথাপি একই রকম নিস্তব্ধতা চারিদিকে। মঞ্জুলিকা এবার চিন্তিত। মা শান্তিলতা দেবীর শোবার ঘরে সে চলে আসে।
- যা ভেবেছি ঠিক তাই। আবার তুমি ওর জন্য কাঁদছ? ফোন করেছিলো বুঝি? কী বলছে? আসতে চাইছে তোমার কাছে? না সেটা হবে না। মঞ্জুলিকার মুখ কঠিন। সে মায়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়। শান্তিলতা দেবীর হাতে তখনও মোবাইলটা। চোখে জল। মঞ্জুলিকাকে দেখে তিনি আঁচলে চোখ মোছেন। মঞ্জুলিকার কান্নাকাটি অপচ্ছন্দ। মাকে বক্তে গিয়েও সে চুপ করে যায়।
- ঠিক আছে আমি বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরী হবে। উবার নিয়ে চলে আসব। চিন্তা করতে হবে না।
- কিন্তু রুণাটা কোথায় গেলো? এখনো তো ফিরল না! একটু দেখবি নাকি? তোর কি একটু দেরীতে বেরোলে হবে? শান্তিলতা চিন্তাকুল।
- না দেরীতে বেরোব কী করে? নির্মলা দেবী আসছেন, তোমায় বললাম না? অতো বড় একজন ব্যক্তিত্ব। তোমায় না ব্রশার দিয়েছিলাম পড়ে দেখতে? তুমি তো কিছুই পড়ো না। আঁচলের কুঁচিটা ঠিক করতে থাকে মঞ্জুলিকা মায়ের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাতে।

শান্তিলতাদেবী চুপ করে থাকেন। শুধু তিনি নন। বাড়িসুদ্ধ সবাই। বাড়ির কর্তা স্নেহপরায়ণ অমলেশ বাবুর কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। মঞ্জুলিকার শাণিত প্রখর অকাট্য যুক্তিতে সবাই চুপ।
-পড়েছি। এথিকস এর পরিসর নিয়ে বলবেন। শান্তিলতা ততক্ষনে ব্রশারটা পেয়ে গেছেন।

- তাহলে বোঝোই তো। খুব ভিড় হবে।আগে যেতে চেয়েছিলাম একটু বসার জায়গা পাব বলে। তোমার এই মেয়ের জন্য সেটা কি আমার ভাগ্যে আছে?
- একটু পম্পাদের বাড়িটা দেখ না। থাকলে ধরে নিয়ে আয়। শান্তিলতা সঙ্কুচিত।
- হ্যাঁ এই একই কথা বল তুমি সবসময়। ধরে নিয়ে আয়। ও যেন আমার কথা শোনার জন্য বসে আছে। আমি যাচ্ছি।
মঞ্জুলিকা বেরিয়ে যায়। হ্যাঁ শান্তিলতা দেবী জানেন আজ নির্মলাদেবী আসবেন বড্ড কঠিন বিষয় নিয়ে কথা বলতে। এও জানেন ফিজিক্স এর ছাত্রী মঞ্জুলিকা এসব নিয়েই অনেকটা সময় কাটায়। দর্শনও সে ভালবাসে। মঞ্জুলিকার বেশীর ভাগ কথাই আজকাল বোঝেন না তিনি। ও যেন আস্তে আস্তে অন্য জগতের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। একটু আগে তার চোখের জল পড়ছিল মেজমেয়ে পাঞ্চালীর জন্য। ওই বা কী করল? যা করল সেটা কী তিনি নিজেও ঘুণাক্ষরে আগেভাগে বুঝতে পেরেছিলেন? কিন্তু কী করবেন তিনি? তার তিন মেয়ে হয়েছে তিন রকম। কাউকেই তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। অন্যমনস্ক তিনি ব্যাল্কনিতে এসে দাঁড়ান। পাশের বাড়িতে মলি গলা সাধছে। মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে শান্তিলতার।

রাস্তায় নেমে দ্রুত হাঁটছে মঞ্জুলিকা। পম্পাদের বাড়িতে একটু দেখে যাবে। এই রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় পম্পাদের বাড়ি। নিম্নবিত্তদের পাড়ায়। এখানে রাস্তার দু ধারেই ছোট ছোট বাড়ি। পুরনো তবে এখনো জীর্ণ নয়।
- তুই একটু বল মিলি। তোর কথা তো বিনু শোনে।
- খাও না কাকু। ঠাম্মা বলছে এতো করে।
মঞ্জুলিকা তাকায় ভেসে আসা একটি বয়স্কা ও কচি গলা অনুসরণ করে। একটি স্বাস্থ্যবান যুবক। ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। কোমর সমান উচ্চতার গ্রিল বাকিটা আড়াল করেছে পথচারীর দৃষ্টি থেকে। গ্রিল ধরে এক অনির্দেশের দিকে তাকিয়ে অবিরাম হেসে যাচ্ছে যুবক আর জড়িত উচ্চারণে অনর্গল কী সব বলে যাচ্ছে। পাশে একটি ছোট মেয়ে। প্রৌঢ়া একটি ছোট্ট খলনুড়িতে ওষুধ তৈরি করেছেন। হয়ত চেষ্টা করছিলেন ওষুধটুকু খাওয়াতে ওই বিনু নামে অর্ধ উলঙ্গ যুবকটিকে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তিনি সাত আট বছরের ওই বালিকার সাহায্য চাইছেন। হঠাৎ যুবকটি একটা হাত বাড়িয়ে দেয় গ্রিলের বাইরে পথচারিদের দিকে। হেসে ওঠে জোরে হা হা করে।আমূল চমকে ওঠে মঞ্জুলিকা।
- ওঃ পাগল! বোঝাই যাচ্ছে! স্টুপিড। জামাকাপড় পরতে এদের কী হয় কে জানে?
একটু তাকিয়েই মঞ্জুলিকা দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে যায়।
অথচ বড় বড় পণ্ডিতরা এদের পাগল বলতে নারাজ। তাঁদের মতে এটা পাগলামি নয়, যুক্তিহীনতা। যুক্তিহীনতা নাকি শুধু অস্তিত্বের অনুপস্থিতি। অস্তিত্ববাদ নিয়ে যাদের অহরহ চিন্তা ভাবনা বিতর্ক তর্ক তারাই এইসব অদ্ভুত যুক্তির কথা বলেন। আস্ত পাগল সব। মঞ্জুলিকা ভাবে।

- আরে রাস্তাটা যে শেষ! কোথায় যেন পম্পাদের বাড়ি?
- দিদি ভাই এই যে, এই যে এখানে আমি। রুণার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে তাকায় মঞ্জুলিকা। ডানহাতে একটা খোলার ছাদের ছোট্ট ঘরের সামনের বারান্দায় রুণা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। মঞ্জুলিকার নজরে পড়ে।
- বুম্বার সঙ্গে খেলছি। পম্পা বাজারে গেছে। তুমি ভেতরে এসো না?
রুণা ভেতরে ঢুকে যায়। এ এক অদ্ভুত, অদ্ভুত অবস্থা। কী করবে মঞ্জুলিকা ভেবে পায় না। রুণা ততক্ষনে ভেতরে ঢুকে গেছে। দুবছরের বুম্বা একা রয়েছে ঘরে তাই। এই মেয়েও হয়েছে তেমনি। মা চিন্তা করছেন। ওরও তো স্কুল আছে , এসব কি ওর মাথায় নেই। এই কথাটুকু রুণাকে মনে করিয়ে দিতেই মঞ্জুলিকা পম্পাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। রাস্তা থেকে নেমে জলা জায়গাটায় হাতখানেক পর পর পাতা ইঁটের ওপর পা ফেলে ফেলে সে পৌঁছে যায়।
রুণা খেলছে বুম্বার সঙ্গে। আসলে ওদের কোন কাজের লোক নেই। পম্পা রুণার বন্ধু। একই বয়স। কী করে যে এ বন্ধুত্ব হয় কে জানে? ওর দাদার চায়ের দোকান। পম্পার মা বাবা নেই। কোনরকমে দিন চলে এই খোলার ঘরের বস্তিতে।
কেন যে রুণা এখানে আসে, মানে আসতে পারে সেটা মঞ্জুলিকা বুঝতে পারে না। ওর রুচিগুলো যে কী রকম হয়েছে – ভাবা যায় না। এই পাড়ায় বিত্তে, শিক্ষায় মর্যাদায় তাঁদের সমকক্ষ খুব কমই আছে। শিক্ষায় মঞ্জুলিকা আগাগোড়া সেরা। পাঞ্চালীও কম যায় না। মঞ্জুলিকা বা পাঞ্চালীর দৈহিক সৌন্দর্যও তাঁদের স্বতন্ত্র আভিজাত্য দিয়েছে।
পাঞ্চালীর সৌন্দর্যের কথা মনে হতেই একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে যায় সে। সেই সৌন্দর্যই কাল হল। মোহনলাল। সেই অটো চালানো ছেলেটা। যার সঙ্গে পাঞ্চালী চলে গেছিলো এক ঝড় বৃষ্টির রাতের অন্যমনস্কতায়। সে, সেই মোহনলাল দেখতে সুন্দর। কুচকুচে কালো রঙে সে অসাধারণ এ্যাট্রাক্টিভ। কিন্তু সে বস্তিতে থাকে। বিত্ত আভিজাত্য শিক্ষা .....!হায় রে! তীক্ষ্ণ অপমান আর লজ্জার গ্লানি এখনো দগদগে হয়ে আছে মঞ্জুলিকার মনে। কোনদিন পাঞ্চালীকে সে ক্ষমা করবে না। কখনো না।
কিন্তু রুণা ... মঞ্জুলিকা ততক্ষনে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ঢুকেই তার অস্বস্তি শুরু হয়ে গেছে আবার। ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা জামাকাপড়, এদিক ওদিক খাবার লেগে থাকা বাসন, উঠোনে জল কাদা, ঘরের বাইরেই খোলা নর্দমা। মঞ্জুলিকার শরীর খারাপ লাগতে থাকে।
- তুই কি আসবি আমার সাথে? ক্রুদ্ধ মঞ্জুলিকা বলে ওঠে।
- কাকিমণি চানে গেছে। কাকিমণি বেরোলেই আমি ফিরব। না হলে বুম্বাকে কে দেখবে বল?
- না তোকে সেটা দেখতে হবে না। অকস্মাৎ রুঢ় হয়ে ওঠে মঞ্জুলিকা।

সঙ্গে সঙ্গে রুণার মুখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে আসে। মঞ্জুলিকা এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ভেতরের ক্রোধের আগুনকে সে নেবাতে চেষ্টা করছে।

-তাড়াতাড়ি চলে আসিস। মা চিন্তা করছেন। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলে মঞ্জুলিকা।

মাকে ফোনে আশ্বস্ত করে একটা খালি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। আজ আর হলঘরে বসার জায়গাটা হবে না। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভাবে মঞ্জুলিকা। সত্যি রুণাকে নিয়ে যে কী করবে সেটা ভেবে কূল কিনারা পায় না মঞ্জুলিকা। কি কুক্ষণেই যে ঠাম্মা তার নাম করুণাময়ী রেখেছিলেন। নামের যে এরকম সার্থক রূপ রুণা দিতে থাকবে সমানে ওরা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। বয়স এখনো এগারো হয় নি এরই মধ্যে এই পাড়ার সবাই চেনে রুণাকে ওর এই অদ্ভুত লাগাম ছাড়া দয়ামায়ার জন্য। অনেকেই সুযোগ নেয়। অল্পবয়সী বউরা তাকে নানা রকম ভাবে খাটিয়ে নেয়। ওই যেমন বুম্বাকে দেখছিল সে। আরও কতো কী করে কে জানে? মঞ্জুলিকা একদিন দেখেছে পাড়ার বোসবাবুদের কাজের লোকের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে রুণা। আর মহিলা দিব্যি পা ছড়িয়ে চোখ বুজে রোদে বসে আরাম খাচ্ছে। মঞ্জুলিকার মাথায় আগুন চড়ে গেছিলো। মঞ্জুলিকার অকস্মাৎ আগমনে সেই মধুর অলস আমেজে যে একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছিল সেটা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে যারা রুণার ভক্ত তাঁদের কাছে মঞ্জুলিকা একজন গব্বার সিং ছাড়া আর কিছু নয়। সেদিন ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাড়িতে এনে জিজ্ঞাসা করেছিল-

- কী করছিলি কী ওখানে। জ্যোৎস্না মাসির চুল আঁচড়াচ্ছিলি কেন?

- না চুল বেশী আঁচড়াইনি তো? উকুন বেছে দিচ্ছিলাম।

- অ্যাঁ! কি বললি? উকুন কী করে চিনলি তুই? আমাদের তো কারো নেই। মঞ্জুলিকা কোনরকমে বলেছিল।

- চিনলাম তো। মাসি দেখাল একটা চুল থেকে বার করে। তুমি উকুন চেনো দিদিভাই?

মঞ্জুলিকা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল সেদিন। তার শিক্ষাদীক্ষার যুক্তি যে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে রুণার নিষ্পাপ সারল্যের কাছে সেটা সে টের পেয়েছিল সেদিন। সেই তিন বছর আগে। এর মধ্যে রুণার সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য, বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সবই বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের অনেক দামী জিনিষ তার কাছ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

- এসে গেছি ম্যাডাম। ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙ্গে মঞ্জুলিকার।

ভাড়া মিটিয়ে সভাগৃহে ঢুকে যায় সে। ততক্ষণে সভা লোকে লোকারণ্য। বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। ইশ কী সুন্দর কথা বলেন ভদ্র মহিলা। বলছেন ‘অহৈতুকি অপরাশি বোধ’ এর অর্থ হোল ‘আমার চেয়ে একেবারে অন্যধরণের লোকের বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান অধিকার বোধ’। চমৎকার! মঞ্জুলিকা ডুবে যায়।

মঞ্জুলিকা জানে না যে অন্যদিকে তখন কী তাণ্ডব চলছে।প্রায় তিনঘণ্টা রুণার দেখা নেই বাড়িতে। শান্তিলতা পম্পাদের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছেন। রুণা নাকি অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে। তিনি সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছেন তারপরে। অমলেশ বাবু কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন তার চেম্বার থেকে। তিনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেছেন রুণার উদ্দেশ্যে। খানিক পরেই অমলেশবাবু কে দেখা গেলো রুণার হাত ধরে ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন শান্তিলতা যে দুজনের মুখই প্রসন্ন। কারো মুখেই আসন্ন বা গত হয়ে যাওয়া কোন দুর্যোগের আভাস নেই।

- কোথায় ছিলি এতক্ষণ? বিরক্তিতে শান্তিলতা চিৎকার করে ওঠেন সব কিছু ভুলে।

- মালিনীদের বাড়ি। কী করবো মালিনীর মোবাইল নেই। ও একটা স্কুলের কাজ শেষ করছিল আমার মোবাইলে লিংকটা খুলে। ওখানে তাই বসেছিলাম। তুমিই বল ভাল করিনি মোবাইলটা একদম ওর কাছে রেখে দিয়ে চলে না এসে?

অমলেশবাবু শান্তিলতার দিকে তাকিয়ে ঘর ছাড়েন। তার স্নান বাকি এখনো। শান্তিলতা তাকিয়ে আছেন রুণার দিকে। রুণা মুখ নিচু করে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বলে উঠলো

- মা ভীষণ খিদে পেয়েছে মা। একটু আলু ভাজা করবে মা? তুমি করবে কিন্তু। সবিতাদি নয়। আমি এখনই চান করে আসি।

রুণা আজকাল জানে মায়ের রাগ কিসে একটু আধটু জল হয়ে যেতে পারে।

শান্তিলতা ওঠেন। নিজেই করবেন আলুভাজা। এই সৃষ্টিছাড়া মেয়েকে নিয়ে তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। ছোট থেকে যেমন তেমনই রয়ে গেছে। নার্সারিতে পড়ার সময় ওর বন্ধু নিখিলেশকে নেমন্তন্ন করে এসেছিল ওর জন্মদিনে ওর মা বাবা সহ। রুণার জন্মদিন সেদিন। কিন্ত সপ্তাহ শেষে পালন করার কথা ছিল। নিখিলেশের বাবার তারাতলায় চিঁড়ে ছোলা বাদাম ভাজার দোকান। সাধারণ গৃহস্থ। নিখিলেশের বাবা মা রাস্তায় এসে আবার ঘুরে চলে যাচ্ছিল ভুল বাড়িতে এসেছে ভেবে। এই বিশাল বাড়ির বহিরঙ্গের প্রাচুর্য দেখে তারা ভাবেনি রুণা এ বাড়ি থেকে এসেছে। কিন্তু রুণা বারান্দাতেই খেলছিল। সে ছুটে গিয়ে নিখিলেশকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এসেছিল। শান্তিলতা খুশি হয়েছিলেন ওদের দেখে। কেক মিষ্টি ভাজাভুজির ব্যবস্থা করেছিলেন। আলাপ করেছিলেন। অবশ্য মঞ্জুলিকা ঘর ছেড়েছিল। কিন্তু নিখিলেশের মা বাবা জড়তা কাটাতে পারেন নি। রুণা পুরোটা সময় নিখিলেশের সঙ্গে খেলা করছিল। কিন্তু তখন তো কতো ছোট ছিল রুণা।

এতক্ষনে শান্তিলতার খেয়াল হয় রুণা অনেকক্ষণ ধরে চান করছে। অমল বাবু খাবার টেবিলে বসে খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। রুণা এলো বেশ অনেক পরে। এসেই...

- আলু ভাজা কই মা ? করেছো? ওঃ আড় মাছ? লেজটা আমার জন্য রেখেছ তো?

- কেন? বাপি কী দোষ করল? বাপি একটু ভাগ পাবে না? অমলেশবাবু খুনসুটি করছেন ।

- এই তোমায় দিচ্ছি বাপি। বলে রুণা বাটিতে রাখা মস্ত বড় লেজের টুকরোটির বেশীর ভাগটাই তুলে দিতে যায় বাবাকে।
- পাগলি আমার! বলে আমলেশ বাবু সস্নেহে নিরস্ত করেন রুণাকে।
- আচ্ছা বাপি তোমায় একটা কথা বলব? খেতে খেতে খুব গভীর মনোযোগে বাবার দিকে তাকায় রুণা।
- বড় হলে কি সবারই বিয়ে হয়ে যায়?
- হ্যাঁ। ইচ্ছে হলে হতেই পারে।
- কেনরে? অমলেশবাবু চাটনির বাটিটা টেনে নেন।
শান্তিলতার সিগনেচার ডিস। আলুবোখরা, কিশমিশ দিয়ে টোম্যাটোর চাটনি। চামচে করে মুখে দিয়েই মন ভাল হয়ে গেল তার।
- দিদির বিয়ে হবে?
- হ্যাঁ। অমলেশবাবুর মুখে আলুবোখরা।
- ভাল ছেলে লাগবে। কোথায় পাবে?
- কেন? আমরা দেখতে পারি। দিদি নিজেই দেখতে পারে। তুইও দেখতে পারিস। চাটনির মন ভাল করা আমেজে তিনি ধীরে ধীরে বলতে থাকেন।
- বাবা আমার হয়ে গেছে। মা আমার লেপটা একটু নামিয়ে দেবে? ভীষণ শীত করছে।
রুণা উঠে পড়তে পড়তে বলে।
- শীত করছে? বলিস কী? শীত কোথায়? অবাক হন শান্তিলতা। কে জানে জ্বর বাঁধাবে কি না।

পরদিন সকাল নটা। শান্তিলতা দেবী মঞ্জুলিকার ঘরে ঢোকেন। গতরাতে মঞ্জুলিকা বাড়ি ফিরেছে অনেক রাতে। দেখেন মঞ্জুলিকার টেবিলে একখানি ফটো। প্রজ্ঞাপারমিতার। অসাধারণ সুন্দর। আইভরির সূক্ষ্ম কাজ করা দামী ফ্রেমে বাঁধানো। দেবীর মাথা একপাশে সামান্য হেলানো, চোখদুটো অর্ধ নিমীলিত। যেন সংসারের সমস্ত স্নেহ, মায়া, বাৎসল্য সেখান থেকে ঝরে পড়ছে। পদ্মাসনে বসে আছেন অন্যমনে, চম্পককলি হাত দুটো শিথিল, বুকের উপর রাখা। সমস্ত অবয়বে এক অনির্বচনীয় কোমলতা। কাল রাতেই মঞ্জুলিকা এটা বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছে। গলিত মাতৃহৃদয়ের এক অসাধারণ প্রতীক - মঞ্জুলিকা বলেছিল। বলেছিল, ইনিই মহাকরুণা। সৃষ্টির উৎস। আরও অনেক কিছু বলেছিল মঞ্জুলিকা। শান্তিলতা বুঝেছেন সে নাকি এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ছবিটা কিনে এনেছে।

- মঞ্জু একটু উঠবি? শান্তিলতা মঞ্জুলিকার গায়ে হাতটি রাখেন। মঞ্জুলিকা তাকায়। তারপরে ধড়মড় করে উঠে বসে।আকাশ কালো হয়ে ঝুঁকে নেমে এসেছে। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। বাতাস ছেড়েছে।
- কী হয়েছে মা ?

- তুই একটু রুণার কাছে গিয়ে বোস। তোর বাবা ওষুধ আনতে গেছেন। আমি একটু বাথরুমে যাব। রুণার রাত থেকে জ্বর নামছে না। কী সব বকছে। জানলা বন্ধ করে দিস বৃষ্টি আসছে।
মঞ্জুলিকা শুনেই দৌড়ে যায় রুণার ঘরের দিকে। রুণা শুয়ে আছে জ্বরের ঘোরে। বিড়বিড় করছে
- ..... কতো কাজ করতে হবে। কতো কাজ ..... কবে করবো ..... পম্পার দিদির জন্য ছেলে দেখব ..... অনেক টাকা লাগবে ..... আমার সোনার বালা দেব ... মালিনী ... আমার মোবাইলটা নিবি ..... কাকিমণি....বুম্বাকে দেখব .... ঠাম্মা তুমি রাস্তায় থাকো কেন?
- কী বলছিস কী রুণা? রুণা রুণা ...
মঞ্জুলিকা রুণার মাথার কাছে নিচু হয়ে বসে ডাকে। ওর মাথাটা কোলে তুলে নেয়। স্তব্ধ হয়ে যায় রুনার কথাগুলো শুনে। আকাশ ভেঙ্গে জল নেমেছে।

শান্তিলতা ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যান। কি যেন তাকে আটকে রাখে ঘরের চৌকাঠে। বৃষ্টির ছাঁট জানলা দিয়ে ঢুকছে। ভিজছে টেবিলের বই, কাগজপত্র পেন পেন্সিল মানচিত্র। মঞ্জুলিকা কাঁদছে আকুল হয়ে।

“যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি”, এর মধ্যে মলির গান আবছা ভেসে আসছে।

আনন্দধারার সাথে দু দশকের পথ চলা

সিদ্ধার্থ দে

জীবনে অনেক কিছুই হঠাৎ করে হয়ে যায়। ভাল, খারাপ সব রকম ব্যাপারই। এই অপরিকল্পিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির প্রভাব প্রায়শঃই সুদূরপ্রসারী হয়।

এমনই একটা আপাত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার আমার জীবনে ঘটেছিল প্রায় ২২ বছর আগে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের এক ঝলমলে দিনে।

ক্যানবেরা থেকে এক রোববার সকাল সকাল বেরিয়েছি অগ্রজ বন্ধু কলেজের সিনিয়ার পার্থ ভট্টাচার্য দার সঙ্গে। গন্তব্য সিডনি। উদ্দেশ্য সিঙ্গাপুর হয়ে কলকাতাগামী উড়ানে পার্থদার কন্যা এবং আমার মাকে তুলে দেওয়া।

গরমকালে ক্যানবেরাতে সন্ধ্যে হতে হতে আটটা বেজে যায়। দুপুর বারোটায় শুরু করলে গনগনে দুপুরে ক্যানবেরা পৌঁছে যাব। পার্থদার পরিচিত সিডনির কয়েকজন কোন একটা পার্কে পিকনিক করছিলেন। সেখানে গিয়ে হাজির হলাম দুজনে।

****

৯০ সালে অস্ট্রেলিয়াতে অভিবাসী হয়ে এসে প্রথমে সিডনিতেই আস্তানা গেড়েছিলাম।

তাই সেদিন পরিচিত দুয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় একটা দারুন খবর কানে এলো। সিডনিতে নাকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আসছেন। উদ্যোক্তা শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় নামে একজন।

আলাপ করলাম শ্রীমন্তের সঙ্গে। আন্দাজ করলাম মধ্য তিরিশের আশে পাশে বয়স। গড়পড়তা বাঙালি চেহারা। বিনা বিলম্বে বিখ্যাত সাহিত্যিকের সিডনি আসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। জানলাম খবরটা সত্যি।

আগে পিছে না ভেবেই জিজ্ঞেস করলাম ওনাকে ক্যানবেরায় আনা সম্ভব কিনা। বেশ ব্যবসায়ী কায়দায় ভদ্রলোক বললেন "সেটা অসম্ভব নয় - তবে আপনাদের এক হাজার ডলার দিতে হবে এই উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্য।"

****

সেটা ছিল আমার অ্যাটেনবরো মুহূর্ত।

সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি।

'শতরঞ্জ কি খিলারী' ছবিতে জেনারেল উট্রামের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সত্যজিৎ প্রখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা রিচার্ড অ্যাচেনবরোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এক সাংবাদিক অ্যাটেনবরোকে প্রশ্ন করেছিলেন: "সত্যজিৎ যখন আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আপনার কি অনুভূতি বয়েছিল?"

কিংবদন্তি অভিনেতার চটজলদি জবাব : "When Ray asks you to act in his film you don't think about it over a cup of tea - you just say yes!"

আমিও সেদিন অ্যাটেনবরো সাহেবের মত বিনা দ্বিরুক্তিতে "হ্যাঁ" বলেছিলাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অস্ট্রেলিয়াতে বারবার আসেন না।

****

সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় ক্যানবেরাতে এসেছিলেন। ২০০১ সালের জুলাই মাসে।
মাঝের ছমাসে শ্রীমন্তর সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। সম্বোধনটা কোন সময়ে আপনি থেকে তুমিতে পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রীমন্ত প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দধারার' কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। যতদূর মনে আছে ঐ সময় নাগাদই আমাদের পরিবার আনন্দধারার মাধ্যমে বাংলা পত্রপত্রিকা আনানো শুরু করি।

আজও - দুই দশকেরও পরে - ডাকযোগে কলকাতার ছোঁওয়া মাখা 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সানন্দা', 'বইএর দেশ' আমাদের ক্যানবেরার ঠিকানায় পৌঁছে যায় টাটকা টাটকা। আমার আবার একটা বাতিক আছে - বই বা পত্রিকা পড়া হয়ে গেলেও প্রাণ ধরে ফেলতে পারি না। এই কারণে গত কুড়ি বছরে অন্যান্য বইয়ের সাথে সাথে কয়েক হাজার বাংলা পত্রিকা আমাদের লাইব্রেরি ঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

সুনীল দাকে আনার জন্য এক হাজার ডলার সহজেই উঠে এসেছিল। কয়েকটা ফোনেই কাজ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে একটা সুন্দর সান্ধ্য অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়েছিল।

এই উদ্যোগে আমাদের একটা বিশাল প্রাপ্তি দিনকয়েকের জন্য সুনীলদা স্বাতীদিকে আমাদের বাড়িতে অতিথি রূপে পাওয়া। গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতির ব্যবহারের উষ্ণতা আমাদের মোহিত করেছিল। পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে না হলেও ওঁনাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

আসলে এই সব সেলিব্রিটিরা দেশে আমাদের মত সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। একটা উন্নত দেশে প্রবাস জীবনের নানা সুযোগ সুবিধার সাথে একটা উপরি পাওনা এঁনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মনে হয় বিদেশে এসে পাদপ্রদীপের আলোক থেকে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতিটা ওঁনারাও উপভোগ করেন এবং বেশ খোলামেলাভাবে প্রবাসীদের সঙ্গে মেশেন।

****

ক্যানবেরায় ২০০১ সাল অবধি বাঙালিদের কোন সংগঠন ছিল না। সুনীল দার ক্যানবেরায় আসার কয়েক মাস পরেই হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু হয়। সুনীলদার ক্যানবেরা সফর, একটা জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - সব মিলিয়ে শহরের বাঙালি বাসিন্দাদের সংগঠিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না।

****

বলাই বাহুল্য, আনন্দধারার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিবারের, এবং সমষ্টিগতভাবে ক্যানবেরার বাঙালিদের যোগাযোগ সুনীলদার সফরের সঙ্গে শেষ হয়নি।

পরবর্তীকালে আর এক দিকপাল সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ক্যানবেরাতে এসেছেন ২০০৯ সালে। উদ্যোগ সেই আনন্দধারার। এই ঋষিপ্রতিম মানুষটির সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে। বর্তমানে ওনার কলকাতায় কিংবদন্তিসম অবস্থান - এই ৮৬ বছর বয়সেও রীতিমত ব্যস্ত মানুষ। তাই বেশী বিরক্ত করিনা। আমার নম্বরটা ওঁনার ফোনে সেভ করা আছে - প্রতিবারই ফোন ধরে ‘হ্যালো’র বদলে বলেন “বলো সিদ্ধার্থ!” এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কি নিরহঙ্কার মানুষ এই শীর্ষেন্দুদা!

****

বছর ছয়েক হল কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছি।

অস্বীকার করব না, বাংলা সাহিত্যের এই দুই মহীরূহর সঙ্গে পরিচয়ের পর বই পড়া ব্যাপারটা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অবসর জীবনে সময় কাটানো কোন সমস্যা হয়নি। আনন্দধারা গত দুই দশক ধরে অবিরতভাবে বইপত্র সরবরাহ করে গেছে। অতিমারীতেও কোন বড় রকমের ছেদ পড়েনি।

এই পড়ার সাথে সাথে একটু আধটু শখের লেখালেখিও শুরু করেছিলাম বছর দশেক আগে। ভাবলে হাসি পায়, আমার মত এক কেঠো ইঞ্জিনিয়রও মোটামুটি নিয়মিতভাবে লিখি এখন। কিছু পাঠকও জুটে গেছে। এঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গোটা দুয়েক বইও প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে একটি সুনীল-শীর্ষেন্দুর সান্নিধ্যলাভের দিনলিপি।

****

আনন্দধারার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমন্ত কিছু লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

উজান বেয়ে যা মনে এলো লিখলাম।

আনন্দধারার জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।

আমার চোখে আনন্দধারা

অসীম দাস

আনন্দধারা আজ পঁচিশ বছরের সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক যুবক।
পঁচিশ বছর আগে যে স্বপ্ন নিয়ে আনন্দধারা সিডনীতে যাত্রা শুরু করেছিল, সে স্বপ্ন আজ অনেকটাই বাস্তবে পরিণত। তার সাক্ষী অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে থাকা আনন্দধারার বহু গ্রাহক, বন্ধু আর শুভানুধ্যায়ীরা।
দেশ ছেড়ে এলেও দেশের নাড়ীর টান ছাড়তে হবেনা – গত পঁচিশ বছর ধরে আনন্দধারা আমাদের সেই প্রতিশ্রুতী দিয়েছে এবং যথাসম্ভব পূর্ণ করেছে।
দেশ, আনন্দবাজার আর সানন্দার নিয়মিত প্রকাশনা সরবরাহ নিয়ে যে যাত্রা শুরু, আজ তা প্রসারিত অনেক নামী দামী লেখক লেখিকাদের সাথে আমাদের মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেওয়ায়।
এক কথায় আনন্দধারা গত পঁচিশ বছর ধরে অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছে দেশের সাথে আমাদের এক নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক সেতু বেঁধে রাখার।
গত পঁচিশ বছর কেমন কেটেছে তার হিসেব করা যেমন প্রয়োজন, এই রজত জয়ন্তীতে তেমনি প্রয়োজন ভেবে দেখার আগামী পঁচিশ বছর কেমন কাটবে।
এই পঁচিশ বছরে আমাদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। সারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আজ আমাদের মুঠোয় (অথবা পকেটে) আর যে কোন বিশিষ্ট লেখা পড়ার সুযোগ মাত্র কয়েকটি ক্লিকের ওপারে।
তা সত্ত্বেও আমাদের মনের খিদে মেটাতে আমরা এখনো খুঁজি বাংলায় লেখা নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, নতুন স্বপ্নের। যে ভাষায় আমরা বড় হয়েছি, সেটা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমাদের গভীর আবেগিক চাহিদা মেটাতে পারে না ।
তাই আশা রাখব আগামী পঁচিশ বছরেও আনন্দধারা যেন তার মূল লক্ষ্যে অটুট থাকে, পুরনো আর নতুন বাংলা সাহিত্যের সাথে আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ রাখার ভুমিকা একই ভাবে পালন করে।

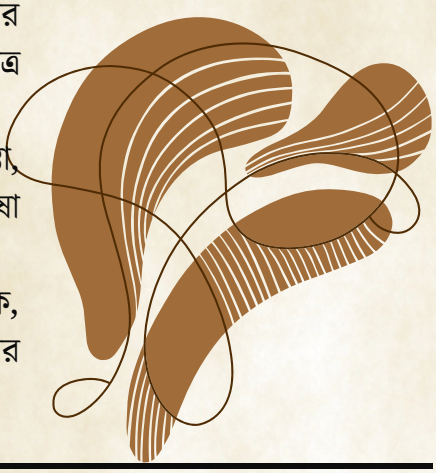

বাংলা সাহিত্যের বিরল রূপ

ড. নিমাই কর্মকার

উপন্যাস, গল্প, কবিতা - এইগুলি হলো বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক রূপ। কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী লেখা যা সচারচর চোখে পড়ে না ও যা লুকিয়ে থাকে অনত্র, সেগুলি নিয়েই তৈরী হয় সাহিত্যের বিরল রূপ। এই প্রবন্ধে এমনকিছু বিরল রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানমনস্ক লেখকঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবাই যায় না। রবি ঠাকুরের সৃষ্টি সম্ভার যেমন বিশাল তেমনই বৈচিত্রে ভরা। মননশীলতায় তিনি সারা বিশ্বের। বিজ্ঞানেও তিনি পরাঙ্গম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় শিশুদের বৈজ্ঞানিক মননশীলতার বিকাশের জন্য তিনি শিশুকোষ লিখে গেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার রহস্য বুঝাতে ও তার অর্থ যেন শিশুমন ধারণ করতে পারে তার জন্য তিনি এমন সব অনবদ্য উপমা দিয়ে গেছেন যা সাহিত্যে বিরল! দুটি নক্ষত্র বা গ্রহের মধ্যে অসীম দূরত্বকে বুঝাতে গিয়ে তিনি কি সুন্দর তুলনামূলক উদাহরণই না তুলে ধরেছেন! তিনি লিখেছেন দুটি গ্রহের মধ্যে দূরত্ব এমন যা ধারণা করা কঠিন। যেন বিশাল হাওড়া স্টেশনের মধ্যে দুই প্রান্তে যদি দুটি মাত্র বালুকণা রাখা যায়, তবে তাদের মধ্যে যে দূরত্ব তা অনুমান করে আন্তঃগ্রহের দূরত্বকে কিছুটা হলেও উপলব্ধিতে আনা যায়। এত সুন্দর উপমা অন্য কোন লেখক দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

ধর্মগ্রন্থ যখন সাহিত্য হয়ে ওঠে: বাংলা সাহিত্যে কথামৃতকার শ্রী মহেন্দ্র (শ্রীম) নাথ গুপ্তের অবদান অনস্বীকার্য। কথামৃতকার শ্রীম, শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণপরমহংসের কথোপকথন সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কি মনোরম ভাবেই না প্রকৃতি-পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা মিশিয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের বাণী ধারণ করে গেছেন। জগতের সাহিত্য ভান্ডারে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসকথামৃত এক অমূল্য সম্পদ! যে পাঠক এই পুস্তকটি পড়বেন ও এই

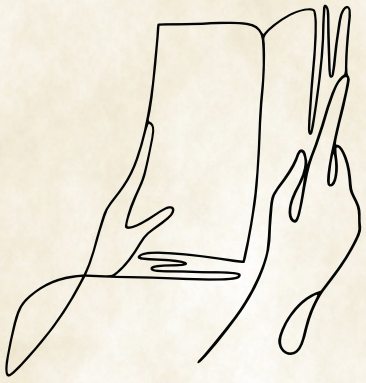

বইয়ের লেখাসমূহ উপলব্ধি করবেন, তিনি সাহিত্য, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, মননশীলতা, বৈজ্ঞানিক ও জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। কথামৃতকার শ্রীম, ঠাকুরের মুখে মুহুর্মুহু নিঃসৃত বেদান্তের সহজ সরল তত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, তার মাধ্যমে অসীম অফুরন্ত সৃষ্টির রহস্য তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক উপদেশাদি ও ওই মুহুর্তের প্রকৃতি বন্দনা কি সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় আপন ভাবে ধারণ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য অবদানঃ শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও এই সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে কম যাননি। তিনি বেদান্ত, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান, সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত, যুবকদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক বাণী দিয়ে জ্ঞানভান্ডার ও বিশ্বের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

একদিকে ঠাকুরের কোমল ভাব। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বী ওজঃ ভাব। একশত বছর পরেও তাঁর বাণী গুলো পড়লে বুকের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। এত তাঁর তেজ ও ওজঃ শক্তি! এত শৌর্য-বীর্য তেজ আসে কোথা থেকে যদি উৎস তেজস্বিনী না হয়? তাঁর ভেতরে যেন সমস্ত সূর্যের শক্তি ভরা ছিল! সমস্ত সূর্যের তেজো শক্তি তাঁর মধ্যে থেকে নির্গত হয়েছিল বলেই তিনি এমন তেজস্বী বাণী লিখে ও তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উপদেশের মাধ্যমে প্রচার করে একদিকে যেমন সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন। অন্যদিকে তেমন জগদ্বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথঃ সৃজনশীলতা ও মনন শক্তিতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেন জোটক। দুই জনই

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পিএইচডি থিসিসে স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এই সংহার টানা হয়েছে যে দুজনেই প্রতিভায় অসীম এবং দুইজনেই বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও অধ্যাত্বিক জ্ঞান ভান্ডার পরিপূর্ণ করে গেছেন। জগৎবাসীকে অমূল্য সম্পদ দান করে গেছেন। জগতকে তাঁদের জ্ঞানের সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে গেছেন। যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব ধারা দুইই বজায় আছে।

আনন্দের গালিচা পেতে আনন্দধারা

সুবীর চ্যাটার্জী

যখন ছোটো ছিলুম তখন penfriend ব্যাপারটার বেশ চল ছিল। বেশ মনে আছে অজানা অচেনা দেশের মানুষদের সাথে বন্ধুত্বের এক সেতু তৈরী হতো inland বা খামের চিঠিতে। শ্রীমন্তের সাথে আমার সেই রকম একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। পঁচিশ বছরের পরিচয় অথচ সাক্ষাতে দেখা হয়নি কারুর। তবু মনে হয় কত যুগের চেনা পরিচয় আমাদের। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই দুটো সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে একই গ্রন্থিতে বেঁধে দিলো, তৈরী হয়েছে এক বিশেষ বন্ধুত্বের।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ গাছের ছায়া পেরিয়ে, রাষ্ট্রের বেড়া ডিঙিয়ে, বইয়ের পাতায় পাতায় আমাদের দেখা হয়, কথা হয়। পুজো বার্ষিকীতে হলো হাথে খড়ি। অবাক চোখে শুনলুম শ্রীমন্তের স্বপ্ন। পুজোর সময় হাতে চলে আসবে পুজো সংখ্যা!

মনে মনে ভাবলাম যাক, আমার মতো সাহিত্য পাগল মানুষ তবে আছে আরো, আজ আলাপ হলো তার সাথে। শুনেই রাজি, এমন জবর খবর, আজ পঁয়ত্রিশ বছর বিদেশে আছি তবে এ কথা শুনবো ভাবিনি। হাতে স্বর্গ বুঝি এল। কয়েক জন চেনা জানাদে র জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, বলে দিলুম, একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি Australia Post এর ইয়া বড়ো এক packet হাজির আর প্যাকেট খুলে এক রাশ ভালো লাগা এবং সাথে মুগ্ধতা।

বেশ মনে আছে বছরটা ২০০৩, পার্থের পুজোতে আমাদের পুজো সংখ্যার এক বিশেষ ষ্টল বসলো। কেউ কিনল কেউ দেখলো, কিন্তু সকলের মনেই এক অফুরন্ত ভালোবাসা। তার পর থেকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতি বছর আমাদের পুজো সংখ্যা চলে আসে, এমনকি এই Covid এও বাদ পড়েনি এই রীতির।

প্রিয় শহর কলকাতা থেকে দূরে তবু সাহিত্যের মধ্যেই বার বার খুঁজে পেয়েছি মনখারাপের antidote, এবার শুনলুম কবি শ্রীজাত

কে আনবে শ্রীমন্ত, এর আগে শীর্ষেন্দু বাবুকে আনবার কথা এগিয়েও আর হয়নি, তাই এবার নিজেকে বললুম না আগে থেকেই বেশি আশা করবো না। তবু খানিকটা উদ্বিগ্নতা থাকলেও চাপা উত্তেজনায় সকাল গড়িয়ে রাত কেটে গেল, দিন গড়িয়ে আর এক দিন, অবশেষে সেই মুহূর্ত, এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলুম সস্ত্রীক, একটু ভয় আবার অনেক উত্তেজনা, কেমন হবে কবি, কেমন হবে আমাদের অভিজ্ঞতা।

একটা ছোট্ট কবিতার অনুষ্ঠান organise করেছি, জানি না কেমন লাগবে সবার, শুধু কবিতা, অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে, তবে নিজেদের পরিবার ছেড়ে এতো দিনে কিছু খুব কাছের মানুষ আছেন যারা আমার এইসব ছেলেমানুষী প্রশ্রয় দেন, তারা পাশে ছিলেন। সস্ত্রীক শ্রীজাত এসেছেন, এমন হইহই করে দিন গুলো কেটে গেলো সে যেন এক স্বপ্ন শুধু।

আজ এতবছর পরেও আমার প্রতি ঘরেই যেনো কবির ছোঁয়া পাই, ওঁর কথা , আমাদের ঘরে বসে ওঁর চটপট facebook এর post, এখনো যেনো মনে হয় এই স্বপ্ন আমার সাথে আছে, থাকবে চিরকাল, আর এ শুধু শ্রীমন্ত আর তার আনন্দধারার জন্যই।

পুজো সংখ্যা থেকে বাংলা বই, তারপর সাহিত্যের মানুষদের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হওয়া, আর আনন্দধারার হাত ধরে তাদের সানিধ্য লাভ, এ আমাদের এক পরম পাওয়া। গত কয়েক বছর থেকে আনন্দধারার নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা, debate আবার নতুন করে বাঙালিয়ানায় আর এক মাত্রা এনে দিয়েছে।

আনন্দের এক গালিচা যেন আনন্দধারা, এমনি করেই যেন আরো অনেক বছর এই গালিচায় বাংলা সাহিত্যের সাথে সম্পকের বাঁধন অটুট থাকে।

আমার নিবেদন

রেজা হোসেন

২০০৩ সালের কথা, প্রথম বারের মত বিদেশ যাচ্ছি, তখনো বৈদ্যুতিক সামাজিক যোগাযোগের আগ্রাসন মনুষ্য সময়ের পুরোটা গিলে ফেলেনি, মানুষের শখ- আহ্লাদ মেটাবার পথ খুব বেশি নেই। আমি বই পড়ি। তাই কিছু বাংলা বই সঙ্গে নিতে চাই যাতে বিদেশে পড়তে পারি। উড়োজাহাজে মালপত্র মোটে নিতে পারব চল্লিশ কিলো। অনেক দিনের জন্যে যাচ্ছি, জামা কাপড়ের পর, বিশেষ ওজন বাকি নেই। বুদ্ধি করে কয়েকটা বই নিলাম মোটা মলাট ছিঁড়ে, যাতে ওজন বেশি না হয়। বিদেশে এসে বেশি মানুষ চিনি না, নিজের গাড়ি নেই, পয়সা কড়িও নেই বিশেষ, অগত্যা একমাত্র পালাবার পথ বই।

দেশ থেকে যা বই এনেছিলাম তার পুরো টাই পড়ে শেষ কদিনের মধ্যে। বাধ্য একই বই ক'বার করে পড়াও হয়ে গেল। বন্ধুদের কাছে যা কিছু ছিল তাও শেষ। তখন ভাবছি - কম পয়সায় কী উপায়ে অস্ট্রেলিয়ায় বই পাই। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান, তখন কোন এক বাংলা মেলায় গিয়ে দেখা মিলল আনন্দধারা বইয়ের স্টল। এবং তার প্রতিপালক শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্ত দা'র সাথে কথা বলে জানতে পারলাম - শুধু বই না, তিনি এখানে নিয়মিত দেশ পত্রিকাও আনেন, যা কিনা নাম মাত্র মূল্যে পোস্টের মাধ্যমে বিলি করা হয়। ব্যস আমার বই পাবার পাহাড়-সম সমস্যা মিটে গেল এক লমহায়। শুধু তাই না। 'দেশ' এর সাথে পাওয়া গেল 'বইয়ের দেশ'। তার সাথে আরও পাওয়া গেল 'বইয়ের দেশ' থেকে পাওয়া নাম গুলো ধরে বইয়ের অর্ডার দেওয়া এবং সেগুলো কলকাতা থেকে আনিয়ে দেওয়া। একজন পাঠক যা চাইতে পারে তার সবটাই এই বিভূঁইয়ে এনেদিয়েছিল আনন্দধারা। মনে মনে তাই কৃতজ্ঞ থাকি তার প্রতি। এখন অস্ট্রেলিয়াতে বাংলা বই সহজলভ্য হয়েছে। কিন্তু বছর বিশেক আগে, আনন্দধারা-ই একমাত্র বয়ে এনেছিল 'আনন্দধারা' আমার ভুবনে।

আনন্দধারা

এক জীবনের অনন্য অনুভূতি

যুঁই

আনন্দধারা ছোট্ট একটা শব্দ, যে শুধু মাত্র এক নাম, প্রতিষ্ঠান বা বইয়ের ঘর নয়, এ এক জীবনের অনন্য অনুভূতি, আনন্দের অফুরন্ত উৎসধারা। এই তো মনে হয় সেদিন আনন্দধারার সাথে পরিচয়, বিদেশ বিঁভূয়ে একমাত্র আপনার জন। জন্মভূমি ছেড়ে শেকড় উপরানো প্রাণ যখন মৃতপ্রায়, আনন্দধারা তখন দিয়েছিল নূতন প্রাণ সন্জীবনী। বাংলা পত্রিকার সাদা পোস্ট এর খামের জন্য অপেক্ষাটা ছিলো বিষন্নতার পৃথিবীতে একমাত্র আনন্দ। এই প্রতিযোগীতার যুগে মনে হতেই পারে সেটা ছিল বাড়াবাড়ি। সেই আপাত শ্লথ দিনগুলোতে বাংলা বই, সংস্কৃতি পাগল কারও জন্য শ্রীমন্তদার বাড়ীর গ্যারেজে সারি সারি বইয়ের স্তূপ ছিলো তীর্থস্থান। সেই গত হওয়া দিনগুলোতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওটিটি প্ল্যাটফরম ছিলো না, ছিলো শুধু বই, নিসঙ্গতার সঙ্গী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমূখ স্বপ্নপূরের নক্ষত্রের এই দক্ষিনের দেশে আগমনও হয়েছিলো আনন্দধারার হাত ধরে, আর আমরা পেয়েছিলাম তাদের সাথে কাটানো কিছু অমূল্য মুহূর্ত।

হাজার ভীড়ের মাঝেও একা থাকা এই আমির সাথে আনন্দধারার বন্ধুত্ব এখনও অটুট। আমার পোস্ট বাক্সে আসা সেই ছেলেবেলার প্রত্রিকার ছাপা কালির সুগন্ধও এখনও অটুট। বাবার বালিশের পাশ থেকে নিয়ে ‘দেশ’ পড়া শুরু, অপর্ণা সেনের সম্পাদিত ‘সানন্দা’ বাবা বা মা’র সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে দখল নেওয়া, পূজোর ‘আনন্দমেলা’ মা,র মূলো ঝুলিয়ে রাখার মতো রেখে দেওয়া স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, পূজো পেরিয়ে কবে নভেম্বর শেষ হবে সেই আশায় দিন গোনা - সেই সোনা রঙের দিনগুলো শ্রীমন্তদার আনন্দধারার হাত ধরে যেনো ফিরে ফিরে আসতো, এখনও আসে। ঝরঝরে বাংলায় ছাপানো গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প, কবিতা, পত্র, নাটক, রেসিপি, অন্দরমহল কতো কি। আমার এই আমি হবার গল্পটাও সেই বই, বাংলা পত্রিকার সাথে জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলাটা যেন হুড়োহুড়ি করে পত্রিকার সাথে সাথে চোখের সামনে চলে আসতো এবং এখনও আসে আনন্দধারার মাধ্যমে।

জীবনে সময়ের সাথে সাথে অনেকেই আসে এবং কাজ ফুরালে চলেও যায়, শুধু একজন কখনও আমাকে ছাড়ে নি বা আমিও ছাড়তে পারি নি, সে হলো ‘বই’। বাবার কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া এই বইয়ের নেশা আমি যত্ন করে লালন করে চলেছি। যদিও বাংলা, ইংরেজি দুই ভাষাতেই সাচ্ছন্দ্য বোধ করি, তাহলেও বাংলা ভাষার বইয়ে আমি আমার আমি কে পাই। বইয়ের ভেতরেই আমি হাজার জীবন বাঁচি যে জীবন আরাধ্য ছিলো, আশ্রয় পাই সব অসহায়তায়, জানতে পারি শত অজানারে, হেঁটে বেড়াই পৃথিবীর পথে পথে।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবন পরিক্রমায় গতো ১৮ টি বছর ধরে বলা যেতে পারে আমার জীবনের অর্ধেক সময় আনন্দধারা আমার সাথে সাথে। আমার বইয়ের তাক ভরে আছে আনন্দধারার বইয়ে, খুব সামান্য কিছু বই উপহার বা অন্য কোন স্থান থেকে কেনা। প্রবাসী জীবনে কাছে থেকে বছর তিন আনন্দমেলার সহযোগী ছিলাম। বইয়ের ভেতর ডুবে থাকা যা কে বলে, শ্রীমন্তদার হাতে হাতে একটু এগিয়ে দেওয়া চা-আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে অথবা মেলার স্টলে। পারলে সব বই আমি কিনে নেই, সেই ছিলো আমার অবস্থা। কিছু ঋণ যেরকম কোনদিন শোধ করা যায় না, আনন্দধারা কাছে আমার সেরকম ঋণ। শ্রীমন্তদার কাছে ঋণ, হাজার প্রতিকূলতায় যে আমাদের প্রাণের খোরাক যুগিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। আনন্দধারার পঁচিশে পা। কি বলবো, কি লিখবো, আমি তো লেখক নই। এই লেখার চেষ্টায় কিছু স্মৃতি হয়ে যাওয়া দিনে ফের ফিরে দেখা। আনন্দধারা তোমার জন্য অফুরন্ত শুভকামনা আগামী দিনগুলোর জন্য, অশেষ কৃতজ্ঞতা বিগত অতীতের জন্য। এভাবেই এগিয়ে যাও আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে, নূতন আলোর পথ দেখাও অন্ধকার সময়ে। বাংলা ভাষার জয় হোক, বাংলা বইয়ের জয় হোক। যে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের প্রাণ দান, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সে ভাষা যেন তোমার মতো বন্ধু, সহযোগী পায় পৃথিবীর চলার পথে।

জন্মতিথির শুভক্ষণে উৎসর্গ তোমাকে ‘আনন্দধারা’ আমার প্রানের সঙ্গীত –
“নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ॥
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

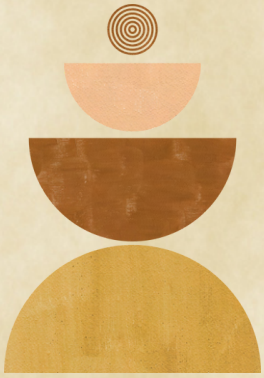

আনন্দধারা

একটি বিশেষ প্রচেষ্টা

উর্মি চক্রবর্তী

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে..

২০১৬ তে এসেছি সিডনিতে - কর্মসূত্রে স্বভাবতই আলাপ হয়েছে অনেক ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি পরিবারের সাথে - অনেক সাহিত্য প্রেমী, কবি, বিদগ্ধজনের সাথে। ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক মিলন আমার মন কেড়েছে। সময়ের সাথে সাথে বেশ মিশে গিয়েছি এই প্রবাসের সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও বিভিন্ন ধারার সংস্কৃতির সাথে - বেশ কটি স্থানীয় বাংলা পত্রিকার সাথে পরিচয় হয়েছে - কোনটি ছাপা হয় বার্ষিক বা কোনটি পাওয়া যায় অনলাইনে। ধীরে ধীরে এই পত্রিকাগুলির গুনবত্তা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সাথে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ করে বিদেশে এক অভূতপূর্ব পুস্তকালয় "আনন্দধারা" আমাদের এই ব্যস্ত জীবনের পান্থপাদপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্তদার নিরলস প্রচেষ্টা "আনন্দধারা" তে বিগত ২৫ বছর ধরে অভূতপূর্ব সঙ্গম ঘটেছে দেশ বিদেশের ও স্থানীয় লেখক ও কবিদের রচনা সংগ্রহের। সযত্নে রক্ষিত বিভিন্ন প্রবাহের পত্রিকা, বিভিন্ন সময় প্রকাশিত জ্ঞানী গুনিদের আলোচনা, লেখক কবিদের প্রবন্ধ গল্প ও কবিতার সমাবেশ "আনন্দধারা" কে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

পূজা বার্ষিকীর জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন সবাই অর্ডার প্লেস করেন তখন আনন্দধারাতে গিয়ে আমরা বেশ কয়েকজন বইপ্রেমী দাদাকে সাহায্য করি। বিভিন্ন ম্যাগাজিন - আনন্দমেলা, নবকল্লোল, সানন্দা, শুকতারা, আনন্দলোক, বর্তমান, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি আলাদা করে অর্ডার অনুযায়ী প্যাক করে সবাইয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন শ্রীমন্তদা।

আনন্দধারায় নিয়মিত ভাবে বিগত ২৫ বছর ধরে সবাই আনন্দ উপভোগ করে আসছে। এছাড়া নানারকমের উপন্যাস, গল্পের বই, কবিতার বই ও কাব্য গ্রন্থ এবং ছোটদের গল্পের বই থাকে আনন্দধারার লাইব্রেরীতে বসে পড়া বা বিক্রির জন্য। আমি ১৪ বছর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যতে থেকেছি কিন্তু সিডনিতে এসে আনন্দধারাতে শ্রীমন্তদার সাথে পরিচয়

হওয়া আর বিদেশে বসে একটা ছাতার তলায় সব রকমের বাংলা বই পাওয়ার আনন্দ এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। তবে এইটুকুই বলতে পারি যে এটি এক বিরাট বড় প্রাপ্তি।

সাথে আছে শ্রীমন্তদার সঞ্চালিত বিভিন্ন সময়োচিত বিষয়ের ওপর বিতর্ক, সাংস্কৃতিক আড্ডা সাথে আবৃত্তি পাঠ ও আলোচনা। বিভিন্ন সময় প্রথিতযশা লেখক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, ও কবি শ্রীজাত বন্দোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি গুণীজনের আগমন, আলোচনা ও স্বরচিত রচনাপাঠ আমাদের এত বছর ধরে মোহিত করে রেখেছে। এইধরনের নানারকম অনুষ্ঠানে যোগদান করতে ভীষণ আনন্দ লাগে।

এই আনন্দধারায় আমি যখনই আসি তখনই পাই উৎকৃষ্ট রচনার সুবাস। আমাদের সাহিত্যমনস্ক চিন্তাধারার প্রগতি আর সাথে ঘটে হৃদয় মনের উদ্বেলিত আনন্দ ও সুন্দর অনুভূতি বিচ্ছুরণের এক অদ্ভুত মিলন। শ্রীমন্তদার বিগত পঞ্চবিংশ বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় "আনন্দধারা" আজ কেবল পুস্তকালয় নয়- এ যে হয়ে উঠেছে এক বিশাল সাহিত্য - সংস্কৃতির মনিমালা - যা আমাদের প্রবাসী জীবনে অনেক না পাওয়ার ব্যথা ভুলিয়ে দেয় ।
শ্রীমন্তদার কর্মকাণ্ড জড়িয়ে গেছে আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে। আনন্দধারার রজত জয়ন্তীতে জানাই অফুরান ভালবাসা, ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা ও সাথে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ।
"আনন্দধারা"র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও প্রগতি কামনা করি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে।

ROBININA DOWNS

Sharmila Gupta

Nina

Nina paced up and down the hallway, taking care not to come near the windows through which the people outside could see her.
They banged on the door again. “Anyone, there,” they yelled, “we are going to start bulldozing the house, Patrick has sent us.”
She could hear them trying to break down the front door. She glanced at her children huddled together in the corner. Neal was trying to comfort his sister Anna who was clutching her rag doll and whimpering.
“Go away, Robinina Downs is ours. This is our house, our land,” yelled Nina and fired some blank shots through the window. The commotion outside stopped immediately followed by the noise of scampering feet.
Nina peeped through the curtains. They were running away. For two long years Nina had tried to make ends meet in this outback homestead. The property had belonged to Robin, her husband’s family and was called Killarney Downs. After marrying Nina, Robin had renamed the property and called it “Robinina Downs.” They had big dreams and plans for the place. But destiny thought otherwise.
They had tried hard to make the farm work, but failed. Robin, had finally left and gone in search of work to Perth, leaving her with the children.
“Keep an eye on them Patrick,” Robin had asked his best childhood friend and owner of the adjoining farm.

Things were tough, but Nina had managed. She toiled hard on the farm and made ends meet with the additional money Robin sent from odd jobs. They were getting by till the wet had given way to the dry summer. The West Australian sun was relentless and scorched every bit of green and dried the water holes turning them into dust bowls. The cattle were dropping dead from thirst.

One night Nina woke to a crackling sound and instantly smelled smoke. "Anna, Neal," she screamed as she rushed towards the children's room. She ran into a firewall that engulfed the kid's rooms. Draping a blanket over her Nina ran through the flames into the kid's bedroom through dense smoke. She picked up Neal's senseless body and ran to Anna. A huge flaming beam crashed around her, burning her ears and hair. She held her children tightly till dawn broke.
Nina returned to the present. The men had gone but why was Patrick trying to evict them from the house?

Robin

That fateful night two years ago, Nina, Neal and Anna had burnt to death in the fire. There was not much left of the homestead.

Robin was inconsolable. "Pat, please get the homestead bulldozed, mate, sell the land. Too many memories here."

Patrick hired some local men for the demolition. The frightened demolishers had returned without even starting. They said they heard Nina telling them to leave and even heard a shot. Through a window, they had seen the children, Neal with his red T-shirt and Anna with her rag doll.

"Nope Pat, the house is spooked. Get someone else pal."

POST DEATH

Amit Kumar Deb

One day I shall be in my prolonged sleep,
No one could make me awake cry and weep.
After years I may not be remembered,
I have the knowledge and aware.

Death will pull me with his cruel arm,
To diverge from worldly pain without harm.
At fair field I have to face court case,
And have to give an account of my earthly trace.

God announces his ultimate decision by ringing bell,
Whether to dispatch my soul to heaven or to hell.
I would be anxiously waiting for the outcome,
Whether heaven or the hell receives me with warm welcome.

But, if again I can take rebirth,
On below over the surface of earth,
I shall plead before the God's king,
To give birth again as a human being.

আমার বই পড়া

আশীষ ভট্টাচার্য

আমাকেযদি প্রশ্ন করা হয় বর্তমানেতোমার জীবনে কি ব্যাপারে তুমিসুখী ?
প্রথমযেটা আমার মাথায় আসেসেটা হচ্ছে এখন যে কোনএকটা বইয়ের দোকানে গিয়ে আমার যদিকোন বই পছন্দ হয়দামের কথা না ভেবেকিনে ফেলতে পারি।
ফুটপাতেবইয়ের দোকানের পাতা উল্টিয়ে জীবনেরঅনেকটা সময় পার হয়েগেছে। কেনার সামর্থ্য হয়নি। যখন সামর্থ্য হলতখন দুঃখবোধ হচ্ছে কত কিছু পড়ারআছে কিন্তু হাতে সময় বড্ডকম।

একটাভাল বই পড়ার পরআমার মনের মধ্যে এমনএকটা আনন্দ হয়ে যা বলেবোঝাতে পারবোনা। এই ভাল লাগাটাদামী হুইস্কির চাইতেও তৃপ্তিকর, একটা ভাল সিনেমা, একজন সুন্দরী মহিলার মুখোমুখি বসেও এমন আনন্দপাবো বলে মনে হয়না।

বইয়েরমধ্য দিয়ে আমি অনায়াসেজয় গোস্বামীর সাথে বৃষ্টিতে ভিজতেপারি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে তাজমহলে এককাপ চা খেতে পারি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতো পেছনেহাত রেখে আমার বাড়িরলনে হাটতে হাটতে ‘চোখের বালি’র ফিনিশিংটা নিয়েতর্ক করতে পারি, - ব্যাপারটাকী কম হলও?

সত্যিকথা বলতে কী এইপড়তে পড়তেই লেখার ভুত মাথায় চেপেছে।শুধু আমার কেন? বইথেকেই জন্ম নেয় আরওবই। অনেকটা আমার বাগানের কুমড়োবিচির মতো।
হোমার, মিল্টন ছাড়া মাইকেল মধুসূদনেরবই হতোনা, স্কটের বই ছাড়া বঙ্কিম-চন্দ্রের বই হতোনা। শেলি, টেনিসন, গীতা ছাড়া রবীন্দ্রনাথেরঅর্ধেক বই লেখা হতোনা।
বইয়েরমধ্যে লুকিয়ে আছে বীজ, শক্তি।

আব্রাহামলিংকন বলেছেন, আংকেল টমস্ কেবিন - লেখানা হলে আমেরিকায় দাসপ্রথাউচ্ছেদ হতে আরও পঞ্চাশবছর বেশি সময় লেগেযেত।
বই-এর সঙ্গে বাঙ্গালিদেরভালবাসা সেই কবে থেকেদেখে আসছি।
কোলবালিশে মাথা দিয়ে বিছানায়আলুথালু শাড়ি ছড়িয়ে আয়েশিবৌদিরা শরৎচন্দ্র পড়ছেন, আর উকি মারাঠাকুরপোরা জানলার আশে পাশে ঘুরঘুর করছে, এটা ছিল মধ্যবিত্তবাঙ্গালি পাড়ার রোজকার দুপুরের দৃশ্য।

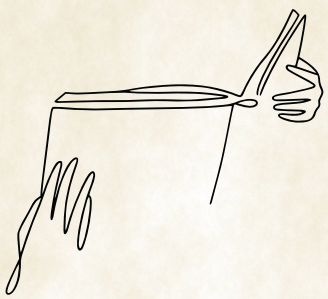

ছোটবেলার সেই পড়ার নেশাআমার এখনো কাটলো না।স্কুলের বইগুলোকে আমার অপাঠ্য লাগতো।এক গুরুজন আমাকে বলেছিলেন, যা ভাল-লাগেতাই পড়বি। বাছ-বিচারের ব্যাপারটাঠিক সময় মত এসেযাবে। কথাটা খুবই সত্য। এখনবুঝি সব বই জ্ঞানদেয় না কিছু বইজ্ঞান হরণ করে।

এইমডার্ন প্রিন্টিং টেকনোলজির জামানায় বইকে বিশ্বাস করাএবং অবিশ্বাস করা দুটোই শিখতেহবে। কোনটা তোমার মগজ ধোলাই করছেসেটা বোঝা খুবই জরুরি।

তবেযাইহোক কী জরুরি, কীকরতে হবে এক পাতায়সে সব বলা আমারশোভা পায়না। আমি বলছি আমারবই প্রেম নিয়ে মাত্র দু-চারটে কথা। সামর্থ্যের কারণেদেশে বই কিনতে পারিনি, দেশের লাইব্রেরী-তো এখানকার মতোদশখানা বই একসাথে ধারদেয়না! আমাদের সাহিত্যের ক্ষুধা মেটাতো প্রসাদ, উল্টোরথ, ঘরোয়া, বিচিত্রা, দেশ।

এসব পত্রিকাকিনে পড়া যেতো ধারকরেও পড়া যেতো। এরাবংশ মর্যাদায় বইয়ের সমকক্ষ ছিলনা। বুকশেলফে এদের স্থান কখনোহতো না। এদের শেষপরিণতি সের হিসেবে মুদিরদোকানে। অথচ বাংলা সাহিত্যেরউজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রথম ঝলকানি থাকতো এদের পাতায় পাতায়।তখন সে সব গোগ্রাসেগিলতাম। সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে ‘দেশ’ এখনো টিকে আছে।দেশের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, এটাই হচ্ছে বড় সমস্যা। প্রতিদ্বন্দ্বীনা থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা আসবেই!

সিডনিবসবাসের শুরুতে এসব পত্রিকার অভাবঅনুভব করতাম। ২৫ বছর আগেআমেরিকার বোস্টন থেকে আগত শ্রীমন্তমুখার্জির মাথায় খেয়াল চাপলো এখানে সে সব পত্রিকাসরবরাহ করার ব্যবস্থা করবে।সেই যে শুরু তারধারা ‘আনন্দধারা’ হয়ে এখনো সিডনিবাসীর মনে আনন্দ দিয়েআসছে। কী করে দেখতেদেখতে কেটে গেলো এতোগুলোবছর। পঁচিশ হয়েছে আরও অনেকগুলো পঁচিশএই ধারা অব্যাহত থাকুকসেই কামনা করে আজ শেষ করছি।

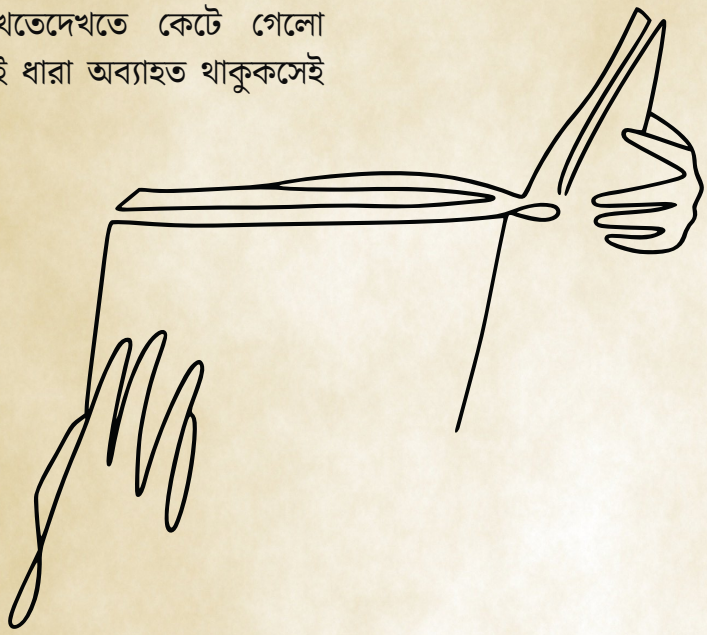

আনন্দধারা'র জন্মদিন

ডঃ দেবু মুখার্জী ও লালী মুখার্জী

দেখতে দেখতে আনন্দধারা'র বয়স পঁচিশ হয়ে গেল! সত্যি সময় যেন ঠিক নদীর স্রোতের মতো চলে যায়। ১৯৯৭ সালে "এ শুধু গানের দিন " নামে একটি গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় আনন্দধারা। তখন থেকেই আনন্দধারা সিডনী ও অষ্ট্রেলিয়ার বাঙালীদের কাছে দেশ, সানন্দা ইত্যাদি পাক্ষিক ও শারদীয়া সংখ্যা পৌঁছে দেওয়া শুরু করে। প্রতি বছর একটি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেই থেকেই শুরু হলো। যদিও গান দিয়ে শুরু পরবর্তীকালে সেটি পরিণত হয়ে গেলো সাহিত্য আসরে।

প্রতি বছর কোন নামী একজন সাহিত্যিক কে শ্রীমন্ত কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে। সুদূর প্রবাসে বসে একজন সাহিত্যিকের মুখের তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা ও লেখা শোনা এবং শ্রোতাদের সাথে প্রশ্নোত্তর এর আসর বেশ দুর্লভ ব্যাপার। আনন্দধারা অন্যান্য দিকেও নিজেকে প্রসার করবার চেষ্টায় আছে। আনন্দধারা বই ঘরে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক আড্ডা। কোভিড এর জন্য মাঝে সব কিছুই থেমে ছিলো, এবার আস্তে আস্তে আবার জেগে উঠছে। আনন্দধারা'র ২৫ বছর পূর্তিতে জানাই দেবু ও আমার শুভ কামনা। আগামী দিনে আনন্দধারা যেন নিজেকে আরো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সবাইকে আরো আনন্দদান করতে পারে।

তিন'এর পরে পাঁচ

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুরন্ত রুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে বেদান্ত ভাবছিল কোন নম্বরটায় টাকা বাজি রাখবে। ওর ভাবনার ভিতর দিয়েই দু'বার ঘুরে গেল চাকা। শূন্য, এক, দুই থেকে আট, নয়; একবার করে চাকাটা থামছে আর উল্লাস ও বিষাদে যুগপৎ ফেটে পড়ছে জনতা। কয়েকজন জেতার আনন্দে আর অনেক বেশি লোক, হারানোর কষ্টে। যারা হেরে যাচ্ছে তাদের দলে থাকতে কেই বা চায় কিন্তু পৃথিবীর সব জুয়ায় চিরকাল যত লোক জিতেছে তার চাইতে অনেক বেশি লোক হেরেছে।

-তা নইলে পর ক্যাসিনোগুলো চলত না। বেদান্তর বাবা ওকে বলেছিলেন।

সেদিন প্রথমবার স্থানীয় একটা ক্যাসিনোয় কয়েক হাজার টাকা হেরে এসেছে বেদান্ত। আর খবরটা বাবা নিজের বিশাল নেটওয়ার্ক মারফৎ জেনে গেছেন, বেদান্ত বাড়ি ফেরার আগেই।

বেদান্ত ভেবেছিল, বাবা রাগ করবেন ওর উপর। কিন্তু অভিনব মালহোত্রাকে বেশ রিল্যাক্সড ভঙ্গিতে ড্রিংক করতে দেখে, ভয়টা ভেঙে গেল ওর।

-আমি জানি তুমি কী ভাবছ। জুয়ায় হেরে না গিয়ে যদি বেশিরভাগ লোক জিতত তাহলে পরে ক্যাসিনোর ব্যবসা আরও ভাল চলত, তাই তো?

বেদান্ত ঠিক এরকম কিছু ভাবছিল না কিন্তু বাবার মুড বিগড়োতে চাইছিল না বলেই ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

-একদম ভুল ধারণা। অনেক লোকের হেরে যাওয়ার ভিতরে একজনের জেতার যা আনন্দ, সবার সঙ্গে মিলে জেতায় সেই আনন্দ পায় না মানুষ। অনেকের গাড়ি নেই বলেই একজন গাড়ি চালিয়ে এত খুশি হয়, যেখানে সবার গাড়ি আছে সেখানে সাইকেল চালিয়ে ঘুরলেই বা ক্ষতি কী?

বাবার কথাগুলো কীরকম মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বেদান্তর। অবশ্য বরাবরই এই মানুষটার কথার মানে ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি ও।

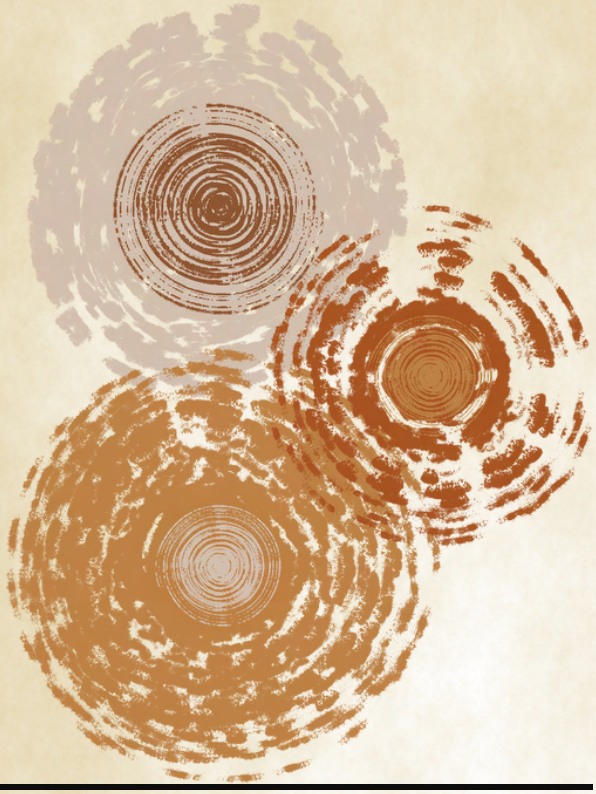

সেই ছোটবেলায় যখন ওকে দেরাদুনের পাবলিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন মা'কে ছেড়ে বোর্ডিঙে থাকবে না বলে খুব কান্নাকাটি জুড়েছিল ও।অভিনব সেই কান্নাকাটির সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেদান্তকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসিয়েছিলেন। আর ড্রাইভারকে উঠতে বারণ করে নিজেই বসেছিলেন স্টিয়ারিং'এর সামনে। মিনিট কুড়ি শহরের নয়নসুখকর কয়েকটা জায়গা দিয়ে ড্রাইভ করে, গাড়িটা থামিয়েছিলেন একটা স্টেশনের সামনে।তারপর ছেলের হাত ধরে প্রবেশ করেছিলেন স্টেশনে। একদম ছোট থেকে গাড়ি করে চলাফেরা করা বেদান্ত স্টেশনের ওই বিপুল ভিড়ের সামনে থতমতো খেয়ে গিয়েছিল। যদিও ইউনিফর্ম পরা অভিনব মালহোত্রাকে দেখে সসম্ভ্রমে সরে যাচ্ছিল লোক, কেউ কেউ সামনে এসে স্যালুট করছিল তবু যখন ওর বাবা ওকে ট্রেনের একটা কামরায় তুলে দিয়ে বললেন যে কয়েকটা স্টেশন পরেই সে যখন নামবে তখন আবার বাবার সঙ্গে দেখা হবে, বেদান্ত কেঁদে ফেলেছিল।
ওর কান্নায় বাবার কিছু যায় আসেনি, আর ট্রেনের ভিতর উঠে বেদান্তর কান্নাটাও একটা বিস্ময়ে বদলে গিয়েছিল। সান্তাক্রুজ নাকি খার কোন স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল তা হারিয়ে গিয়েছিল বেদান্তর স্মৃতি থেকে কিন্তু দাদারে ওকে একটা লম্বা লোক, ধরে ধরে নামিয়েছিল ট্রেন থেকে, স্পষ্ট মনে আছে বেদান্তর। পরে বুঝেছিল যে লোকটা পুলিশেরই কোনও সাব-ইন্সপেকটর বা কনস্টেবল, ডেপুটি কমিশনার অভিনব মালহোত্রার নির্দেশে যে মেঘের আড়াল থেকে খেয়াল রাখছিল বেদান্তর উপর আর যখন প্রয়োজন তখন বেরিয়ে এসেছিল আড়াল ভেঙে। বাড়িতে ফিরে আসার পর মা ব্যাপারটা জানতে পেরে মৃদু অনুযোগ করেছিল বাবার কাছে কিন্তু বাবা মাছি তাড়ানোর মতো করে মায়ের কথাগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।
-বেদান্তকে ছোট থেকেই জানতে হবে যে ও একজন পুরুষমানুষ আর পুরুষমানুষকে জীবনের যুদ্ধগুলো একা লড়তে হয়। যুদ্ধ জিতে ফিরে এলে সংবর্ধনা পেতেও পারে, না পেতেও পারে কিন্তু লড়তে ভয় পেলে পরে তো টিকতেই পারবে না।
মা আর কথা না বাড়িয়ে সরে গিয়েছিল সামনে থেকে। আর বেদান্ত বুঝেছিল যে ওকে এবার বাড়ি ছাড়তেই হবে।
খুব যে কষ্ট হয়েছিল তা নয়। ওই পনেরো-কুড়ি মিনিটের ট্রেন-জার্নি এমন একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ভরে দিয়েছিল ভিতরে যে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে এসে মা যখন কাঁদছে তখনও বেদান্তর কান্না পায়নি। ও বরং হাসিমুখে মা'কে জড়িয়ে ধরে বলতে চাইছিল যে কয়েকমাস পরেই ছুটিতে বাড়িতে ফিরবে আর যেদিন ফিরবে সেদিন আর ওকে দেখে কেউ 'বাচ্চা' বলতে পারবে না, উলটে মেনে নেবে যে 'বেদান্ত ইজ আ ম্যান'; নিজের সব যুদ্ধ যে একা-একাই লড়তে সক্ষম।
তারপর অনেক জল বয়ে গেছে নদী আর সমুদ্র দিয়ে, অনেক কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়েছে বেদান্তকে, এমনকি একবার ওকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল একটা কোনও মাফিয়া গ্যাং কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ও কেঁদে ফেলেনি কারণ জানত যে যুদ্ধটা একা-একাই জিততে হবে।

কিন্তু এত বছর পর আটলান্টিক তীরবর্তী এই শহরে জোছনা রাতে একা একটু বিভ্রান্তই লাগছে বেদান্তর কারণ ও তো যুদ্ধ নয় জুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখানে সাহস কিংবা স্ট্যামিনার কোনও পরীক্ষাই হবে না, পুরোটাই নির্ভর করবে ভাগ্যের উপর।
-আমার পায়ে একটা কাচের টুকরো ঢুকে গেছে খুব সম্ভব, আপনি একটু দেখবেন?
ক্যাসিনোর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল বেদান্ত একটা সিগারেট হাতে। এমনি যে খুব একটা স্মোক করে ও তা নয় তবে আজ ইচ্ছে করছিল। এখন প্রায় কোনও ঘরের ভিতরেই ধূমপান করা চলে না, ধোঁয়া টানার আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বাইরে এসে দাঁড়ানো। সমুদ্র লাগোয়া হলেও এখানে শীত বেশ জবরদস্ত তার উপরে ঢেউয়ের ছোঁয়ায় তার ধার আরও বেড়ে গেছে। বেদান্তর পাশে যে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল, তার ধারও খুব কিছু কম নয়। একটা অফ-শোল্ডার গাউনকে এই আবহাওয়ায় যেভাবে ক্যারি করছে মেয়েটা তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। উচ্চতায় বেশ অনেকখানি মেয়েটা। চোখদুটো টানা টানা এবং দৃপ্ত, ধারালো কিন্তু পরিমিত নাক আর ত্বকে একটা হালকা বাদামি আভা যা সহজাত কিংবা সমুদ্রজাত যে-কোনওটা হতে পারে।

-আপনি কি এখানকারই বাসিন্দা নাকি ট্যুরিস্ট আমার মতো? মেয়েটির পায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল বেদান্ত। ওর হাত তখন মেয়েটির পা আর লনের ঘাসের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে একটা কাচের টুকরো খুঁজে চলেছে। একটু দূরে একটা বারবিকিউয়ের সামনে অজস্র লোক হুল্লোড়ে মেতে উঠছে যতবার একটি মৃত মাংসখণ্ড একটা জ্যান্ত আগুনে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। বেদান্তর মনে হচ্ছিল যে মেয়েটির পা'টাই সেই জ্যান্ত আগুন আর তাতে হাত বোলাতে বোলাতে কতক্ষণই বা কারও হাত, মরার মতো নিস্পৃহ থাকতে পারে?

-কাচ পেলেন?

-কই না তো।

-তাহলে কী খুঁজছেন, এতক্ষণ ধরে?

বেদান্ত লজ্জা পেয়ে হাতটা সরিয়ে নিল।

-অবশ্য ভারতের লোকেরা একটা দেশলাই কাঠির বাক্স হারালেও অনেকক্ষণ ধরে খোঁজে।

-আপনিও ইন্ডিয়ান, তাই না?

-অবভিয়াসলি।আই অ্যাম শালিনী কালে। কিন্তু আপনার বুঝতে এতক্ষণ লাগল কেন?

বেদান্ত আবারও বিব্রত হল, আসলে আপনার মুখটা এমন আন্তর্জাতিক। মনে হচ্ছিল, সাইপ্রাসেরও হতে পারে, গ্রিসেরও, মিশরের হওয়াও অসম্ভব নয়।

-আমচি মুম্বাই, মনে হয়নি একবারও? শালিনী একটা হাসি হাসল যেখানে ঠাট্টা আর খুশি আধাআধি মিশে আছে।

-আমিও মুম্বাইয়ের। যদিও আমার বেড়ে ওঠা ভারতের অনেকগুলো শহরে। স্টিল আমি ভিতরে ভিতরে মুম্বাইকার কারণ, সি-সাইড আমাকে ভীষণ টানে। বেদান্ত নিজের দুটো হাত এগিয়ে দিল শালিনীর দিকে।

শালিনী নিজের ডানহাতটা বেদান্তর দুটো হাতের মাঝখানে রেখে আর একবার হাসিটা হাসল, ঠাট্টার ভাগটা কমিয়ে।

- ক্যাসিনোয় বাজি ধরতেই এসেছিলাম কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারব।

-পুরুষরা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে হারছে ততক্ষণ তাদের কোনও প্রবলেম নেই। শুয়ে হারতে শুরু করলে, প্রবলেম। শালিনী চোখ মারল বেদান্তকে।

-বেদান্ত জোরে হেসে উঠল।কিন্তু ঠিক এরকম ইয়ার্কি প্রথম আলাপেই কোনও মেয়ের কাছ থেকে শোনেনি বলে অথবা সামান্য একটু লাজুক প্রকৃতির বলেই ওর কানদুটো লাল হয়ে উঠেছিল।

শালিনী যেন সেসব কিছু দেখতেই পায়নি এমনভাবে বলে উঠল, আপনি কি প্রায়ই আসেন এখানে?

-আজ প্রথম এলাম।

-আই সি। এখানকার মতো প্রন আর ক্র্যাবস এই শহরের কোথাও পাওয়া যায় না।

-আজই ট্রাই করতে পারি যদি আপনার অসুবিধে না থাকে!

-আমার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তার আগে আপনাকে তো জুয়োয় একটা অ্যামাউন্ট জিততে হবে। হেরো লোকের কাছ থেকে ট্রিট নেওয়া যায়?

-হেরো কেন হব, আমি এখনও এক টাকাও বেট করিনি।

-দেন ডু। মাঠে নামিনি বলাটা তো কোনও স্পোর্টসম্যানের গৌরব হতে পারে না?

-ওকে, আই উইল। কাম উইথ মি। বেদান্ত নিজের ভিতরের অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণটা পরিষ্কার বুঝতে পারল।

অনেকটা জায়গা নিয়ে এই হোটেলটা। এখানে বিরাট সুইমিং পুল, মস্ত বড় বারবিকিউয়ের জায়গা, আবার রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠা ক্যাসিনো। এক ছাদের নিচে না হোক, এক কম্পাউন্ডের ভিতর সবকিছু, লোকে ভিড় করবে না কেন?

ক্যাসিনোয় ঢোকার আগে সামান্য থমকে গেল শালিনী। একটু ঝুঁকে নিজের ড্রেসটা ঠিক করে নিয়ে সেই হাসিটা হাসল যা পৃথিবীর যে-কোনও হিরেকে লজ্জা দিতে পারে।

এক-একটা মুহূর্ত নিজের গায়ে এমন নকশা এঁকে নেয় যে মুহূর্তটাকে মনে থাকে না আর, নকশাটাই সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

নক্ষত্রে তার চাহনি, চাঁদে তারই বিভঙ্গ। আর সে যদি হঠাৎ আরও একটু কাছে ঘেঁষে এসে মুখটা সামান্য নামিয়ে ফিসফিস করে, কত নম্বরে বাজি ধরলে ঘুরন্ত রুলেট টাকা উগরে দেবে জানেন তো?

বান্ধবী যে বেদান্তর আগে ছিল না তা নয়। তবু, চেয়ারের দুলুনি দিয়ে যেমন ভূমিকম্প মাপা যায় না, আগের কাউকে দিয়ে সদ্য পরিচিত এই মেয়েটির পরিমাপও অসম্ভব। বেদান্ত টাল খেয়ে গেল।

শালিনী ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে একটা সংখ্যা বলল।

বেদান্ত একটা যন্ত্রচালিত রোবটের মতো নিজের হাতের কয়েকটা আঙুল শালিনীর দিকে তুলে ধরে কনফার্ম করে নিতে চাইল সংখ্যাটা।

শালিনী নিজের বুড়ো আঙুলটা বেদান্তর দিকে তুলে ধরে এবার আর হাসল না, ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে বেদান্তর গালে অতর্কিতে চুমু খেল একটা ।

বিদ্যুতস্পৃষ্টের মতো নিথর হয়ে গেল বেদান্ত। না, নিথর হল না। কেঁপে উঠল।

শালিনী ওকে সামান্য একটু সময় দিল। তারপর ওর হাতটা ধরল।

ক্যাসিনোর ভিতরে যাওয়ার জন্য।

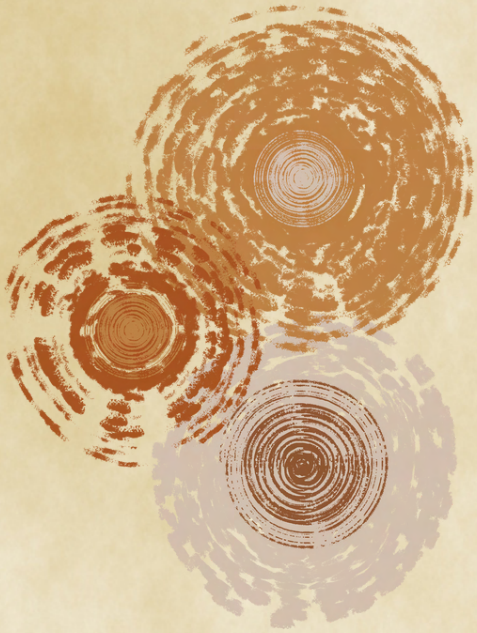

২

" না, সে কোনও কন্যা নয়, নারী নয়, উদাহরণও নয়;
সে সেই রাস্তা যেখানে পরিস্থিতি বাঁক নেয় ঝড়ের দিকে
আর দিনগুলো মিশে যায় গোধূলিতে
সে অন্তহীন এক রাত্রি
অনন্ত কোনও সকাল
সে গুটিয়ে যেতে পারে যেন শামুক
আর বিস্ফারিত হয় আতশবাজির মতো
যেভাবে অসুখ এসে দানা বাঁধে ফুসফুসে
সে চারিয়ে যায় হৃদয়ে
যখন আরোগ্য দেখা দেয় ললাটে
সে ছড়িয়ে পড়ে নিশ্বাসে
তার কোনও ঘর নেই,
ওই শরীরই তার ঘর
তার কোনও শরীর আছে কি?
হাজারও বাসনা দিয়েই তৈরি তার অবয়ব
তাকে ধরা যায় না, ধরা যায় না, যায় না...
কারণ সে অধরা...

বারোশো বছরেরও আগে এই কবিতা লেখা হয়েছিল এক নগরনটীকে ঘিরে আর লিখেছিলেন এক চিনা পর্যটক যিনি ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। কিন্তু তবুও সেই নটী যে নগরে থাকত, তার ভিতরে তিনি ঢুকতে পারেননি কারণ তাঁর আগমনবার্তার সঙ্গেসঙ্গেই রাজার কানে আসে যে এক অচেনা জীবাণু চিন দেশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে।

-আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না মহারাজ, এই ব্যাধি কী বিপুল পরিমাণে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।এক-একটা নগর পলকে উজাড় হয়ে যায়। আমার কয়েকজন সঙ্গী জাভাদ্বীপে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে জনাতিনেক মারা গিয়েছে খবর পাচ্ছি। আপনার রাজ্যে প্রবেশ করার আগেই এক তামিল সওদাগরের মুখে

শুনলাম, এই রোগের প্রকোপে হাজারও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, আরও হাজার হাজার ধুঁকছে। শষ্যক্ষেত্রে ঝলমল করছে সোনালি ধান, নদীতে টলমল করছে জল, বাগানে কলকল করে উঠছে পাখি, আস্তাবলে খলবল করে উঠছে তেজি ঘোড়ারা, কেবল মানুষ মরছে, মানুষ।

ঘোড়া বিক্রি করতে আজ বহুবছর রাজদরবারে আসছেন যে মানুষটি তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারলেন না রাজা। গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, আশ্চর্য রোগ তো!

-তাহলে আর বলছি কী শাহেনশাহ? এই রোগ কোনও পশু-পাখি-পতঙ্গকে ছুঁয়েও দেখে না, এর যত আক্রোশ কেবল ইনসানের উপর। আমার যে সঙ্গীরা ফিরতে পারেনি, নিজের নিজের কায়ামতের সঙ্গে পথেই যাদের দেখা হয়ে গেছে, তাদের ঘোড়াগুলো দিব্যি ছুটে বেড়াচ্ছে হয়তো।

-এই রোগের কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি এখনও? আমি তো শুনেছি চিন দেশে খ্যাতনামা সব বৈজ্ঞানিক আছেন?

-বিপদের সময় নানান গুজব বাতাসে ওড়ে, জানেনই তো মহারাজ। আর তাদের এক-একজনের গতি আমার সেরা ঘোড়াটার চাইতেও অনেক বেশি।কী আর বলব আপনাকে, আমি এও শুনেছি যে ওই দেশেরই দু'জন বৈজ্ঞানিক নাকি নিজেদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে এই জীবাণুর জন্ম দিয়েছেন আর তারপর তাঁদেরই এক ভৃত্যের অবিমৃশ্যকারিতায় সেই জীবাণু আজ মারণরোগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।

-এমনও হয় নাকি? কিন্তু ওইসব সত্য-মিথ্যা মেশানো কল্পনা বাদ দাও, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই রোগ ছড়ায় কীভাবে? আর এর থেকে বাঁচার উপায়ই বা কী?

-সে কি আর আমিই জানি জাঁহাপনা? তবে যেটুকু শুনেছি, বিপদ বাড়ে মেলামেশায়। মানে ধরুন, আপনি একটা মেহফিলে গিয়ে বসেছেন, সেখানে আরও পাঁচশো লোক আছে, এবার সেই মেহফিলে এসে উপস্থিত হল এমন একজন যার শরীরে এই রোগ বাসা বেঁধেছে ইতিমধ্যেই। ব্যাস, ওই একজনের নিশ্বাস থেকেই এই রোগটা ঘরে হাজির পাঁচশোজনের মধ্যে চারিয়ে যাবে।

-তুমি কী বলছ হে? আমার তো রীতিমতো ভয় করছে। কত অসুস্থ লোকের সঙ্গেই তো আমাদের নিত্য মোলাকাত হয় কিন্তু তারা তাদের শরীরে অসুখকে লালন করে, নিশ্বাসে নয়।

-সাধে কি আর প্রাণঘাতী রোগ বলছি? তবে এই রোগের হাত থেকে বাঁচার প্রাথমিক রাস্তা হচ্ছে কোনও ভিনদেশিকে ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না দেওয়া।

-সে তো তুমিও ভিনদেশি!

-আমি আমার ঘোড়া নিয়ে একমাসেরও পূর্বে আপনার রাজ্যে প্রবেশ করেছি আর তখনও এই রোগ চিনদেশের বাইরে জাভা-সুমাত্রা ছাড়া অন্য কোথাও নিজের মৃত্যুছাপ রাখতে পারেনি।

-আর এখন?

-পাকা খবর নয় তবে যা কানে আসছে তা ভয়ঙ্কর। এই রোগ নাকি এখন অতি পূর্বে জাপ দেশ এবং ঘরের কাছের শ্যাম দেশেও হানা দিয়েছে।

- তা হলে তো অবিলম্বে লি ইউয়ানের সম্মানে আমরা যে ভোজসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি তা বাতিল করতে হয়। রাজার গলা শুনে বোঝা গেল, তিনি কতটা উদ্বিগ্ন।

-আমার মনে হয় না সেটা উচিৎ হবে। প্রথমত, এই অবস্থায় তাঁকে বারণ করা হবে কী উপায়ে আর বারণ করলেই বা তিনি কোনও পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া ফিরে যাবেন কোথায়? দ্বিতীয়ত, আমাদের রাজ্যের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। অতিথিকে এখানে সবসময়ই দেবতার সম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে। আজ হঠাৎ কাউকে দরজার বাইরে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে, দেশেবিদেশে আমাদের বদনাম হবে না? বিশেষ করে যিনি আসছেন তিনি যখন এত নামী একজন শিল্পবোদ্ধা?

-একজন নর্তকীকে রাজসভায় প্রবেশাধিকার দেওয়ার ফল দেখছেন তো রাজন? যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, তাই নিয়েও কথা বলতে হবে! আরে তোমার হাত-পা ছোড়ার সুখ্যাতি রটবে বলে রাজ্যের সব নাগরিকের জীবন নিয়ে পাশা খেলতে

পারি না আমরা। মহামন্ত্রী সুদত্ত রাগে ফেটে পড়লেন, অধরার কথা শেষ হতে না হতে। অধরা সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেখল মহারাজ অতন্দ্রকিশোর মহামন্ত্রীর কথার কোনও প্রতিবাদ করেন কি না। যখন রাজার মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোল না তখন সে ধীরে ধীরে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রাজার উদ্দেশে দু'হাত জোড় করে বলল, মহারাজ আপনি আপনার মহামন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিন যে আমি হাত-পা ছুড়ি না, আমি একজন শিল্পী। এ ছাড়া আপনার কাছে আমার একটিই অনুরোধ, লি ইউয়ানকে যখন এই অভিলাষা নগরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তখন আমাকেও নগরের বাইরে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক।

-ঢং দেখেছেন মহারাজ, একজন নাচনেওয়ালির ঢং? আমাদের 'অভিলাষা' চুলোয় যাক, ওকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি কুড়োতেই হবে। সুদত্ত কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে বলে উঠলেন।

ওই নির্লজ্জ ইতরতার সঙ্গে পাল্লা দিতে একদমই ইচ্ছে করছিল না অধরার। কিন্তু সুদত্তর কথাগুলোর চাইতেও অতন্দ্রকিশোরের নীরবতা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছিল ওর মনে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল অধরা। রাজা আর ওর ভিতরকার যে গোপন সেতু তারও কি কোনও মূল্য নেই তাহলে? থাকলে পরে অধরার এতখানি অপমানের সামনে অতন্দ্রকিশোর এমন চুপ করে আছেন কী করে? যে জীবাণু মানুষের নিশ্বাস থেকে নিশ্বাসে বিষের সংক্রমণ ঘটায়, তার কথা তো আজই প্রথম শুনল অধরা। কিন্তু যে জীবাণু শিল্পীকে অপমান করে, শিল্পকে অপমান করে, আলোকে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চায়, অন্ধকারই একমাত্র সত্যি, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বেরোবে না অতন্দ্রকিশোরের মুখ দিয়ে? তাহলে সেই মুখ থেকে অধরার যত প্রশংসা বেরিয়েছে, সবই মিথ্যে। সেই মুখ যতবার অধরার শরীরের বিন্দুতে বিন্দুতে নেমে এসেছে, চুম্বনে, লেহনে, মুদ্রিত করেছে নিজের তৃপ্তি, মিথ্যা তাও! মিথ্যা সেই মিনার যা বাইরে থেকে অভ্রংলিহ কিন্তু ভিতর থেকে শূন্য। অবশ্য শূন্যই বা কীভাবে বলা যায় সেই মিনারকে যা মাটির ভিতর চারিয়ে দিয়েছে নিজের শিকড়? বরং তাকে তুলনা করা যেতে পারে সেই ফলবান গাছের সঙ্গে যা ফল দেয় কিন্তু ফলে স্বাদ দেয় না, মানুষ তো সৃষ্টি করে, মানুষের মনের খবর রাখে না।

•••

অভিলাষা নগরকে কেন্দ্র করেই অভিলাষা রাজ্য। তাই রাজধানী আর রাজ্যের নাম একই। তবু রাজ্যের পূর্ণতা নগরে থাকে না, সেখানে বড় বেশি ধাতু আর পাথরের সমারোহ। উন্মুক্ত প্রান্তর, বিস্তীর্ণ শষ্যক্ষেত্রের মাধুর্য দেখার জন্য নগরের বাইরে পা বাড়াতেই হয়।

রাজা অতন্দ্রকিশোরের নির্দেশে যখন রাজধানীর চতুর্থ প্রবেশদ্বারের বাইরে এক পর্ণকুটির বানিয়ে দেওয়া হল অধরার জন্য তখন ওর মনে হল যে প্রকৃতি যেন মেঘ না চাইতেই জলধারায় স্নান করিয়ে দিয়ে গেছে ওকে।কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই ও হরিণদের ছুটোছুটি দেখতে পায়, অনেক অচেনা পাখি এসে বসে ওর অঙ্গনে, অভিলাষার ভিতরে রাতদিন শকট চলার শব্দ আর আকাশ ঢেকে রাখা ধুলোর আস্তরণের চাইতে কত অন্যরকম এই ঘন নীল আকাশ আর প্রাণীবৈচিত্র্যের সমারোহ। অভিলাষা থেকে যখন কোনও দণ্ডিতকে নির্বাসিত করা হয়, এই পথ দিয়েই তারা বেরিয়ে যায় আর কখনও না ফেরার জন্য। অতন্দ্রকিশোরও কি ওকে সেভাবেই পাঠিয়ে দিলেন বাইরে? বহির্বিশ্বের একজন অতিথির মুখের উপর দরজা বন্ধ করতে না চাওয়ার অপরাধে? কিন্তু এই প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবনে বহিষ্কারটাকেও যে মুক্তি বলে বোধ হচ্ছে। তার কী করা!

-আমাকে তো আটক্রোশ দূর থেকেই জানিয়ে দেওয়া যেত যে আমি অবাঞ্ছিত। আমি পথ পরিবর্তন করে ভিন্ন কোনও রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতাম।

-কিন্তু তাহলে পরে আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হত কী করে?

-সৌভাগ্য কেন বলছেন? আমার জন্য আপনাকে অযথা দুর্ভোগ পোহাতে হল। এতবড় একজন শিল্পী, যিনি কি না অভিলাষার নাম দূরদূরান্তে পৌঁছে দিয়েছেন আজ তাকে এভাবে নগরের বাইরে এসে দিন কাটাতে হচ্ছে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বিশ্বাস করুন।

-আপনি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার গল্প জানেন লি ইউয়ান? বাসবদত্তাও আমার মতোই নগরনটী ছিল। যখন সে মারী গুটিকায় আক্রান্ত হল তখন তাকে ভোগ করা মানুষগুলো সব পালিয়ে গেল, আর শুশ্রূষা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন, উপগুপ্ত।

-কিন্তু আমি সন্ন্যাসী নই আর আমার ক্ষেত্রে তো আপনিই...

-আমি আসলে ওই বাসবদত্তার শরীরেই উপগুপ্তর আত্মাকে ধরতে চেয়েছিলাম লি। একজন শিল্পীর ইচ্ছে হয় না, বিভিন্ন চরিত্রকে নিজের ভিতরে ধারণ করার? তবে আমি তো শিল্পী নই, আমি কেবলই হাত-পা ছুড়ি, কী বলেন? আর সেইসব কর্মকাণ্ডর এত ভক্ত যে তাদের একজন আমায় গোপনে আবার নগরে প্রবেশ করানোর প্রস্তাবও দিয়ে রেখেছে। আপনি যাবেন মাননীয়? আমি আপনাকে এমন ছদ্মবেশে সাজিয়ে দেব যে কেউ বুঝতেই পারবে না, আপনি কে!

-ছদ্মবেশে কোথাও ঢোকার চেষ্টা করাটাকেই আমি নিজের অপমান বলে মনে করি। আর তাছাড়া কেন ছদ্মবেশ নেব, আমি তো গত তিন বছর যাবৎ এই বিস্তৃত উপমহাদেশের এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুই ক্রোশ অন্তর যে দেশের জল বদলে যায় আর চারক্রোশ অন্তর ভাষা তার সুরভিতে মাতোয়ারা হয়ে আছি।

-আপনি ঘোড়ায় চড়ে কেন যাত্রা করেন না ইউয়ান? আপনার যাত্রার সময় কমে যেত, পরিশ্রম লাঘব হত...

ইউয়ান হেসে উঠলেন, অনেক চিনেদের একটা সংস্কার আছে, তারা মনে করে, ‘চার’ একটা অপয়া শব্দ, অশুভ সংখ্যা। আমার নিজের মধ্যেও এই সংস্কার বা কুসংস্কার একটু বেশিমাত্রায় বিদ্যমান তাই চারপেয়ে জন্তুর পিঠে চাপা আমার না-পসন্দ। অবশ্য অনেক আগে একবার একটি ঘোড়া আমায় পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। সেটাও কারণ হতে পারে...

অধরার মুখে মেঘের ছায়া পড়ল যেন, আমিও তো চার হাতে পায়েই আমার যা কিছু অর্ঘ্য সব নিবেদন করি।

-আপনি নিজেকে একটা পশুর সঙ্গে তুলনা করছেন?

- শিল্পীদের পশুর জীবন কাটাতে হয় না বুঝি? তাদের বুঝি কেউ কখনও খাঁচায় বন্দি করে রাখে না? কিন্তু আমি বলছি, আপনি মিলিয়ে নেবেন, আমাকে অভিলাষার বাইরে রেখে রাজা অতন্দ্রকিশোরও শান্তিতে ঘুমোতে পারছেন না । তিনি আমাকে আবার অভিলাষার ভিতরে ডেকে নেবেন আর সেদিন আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়েই ঢুকব। এবং সেই প্রবেশ এই চতুর্থ প্রবেশদ্বার দিয়ে নয় প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়েই হবে।

-এত নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছেন?

-কেন হব না? রাজার জন্য আমি কি আমার প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দিইনি? আমি কি নিজের শিরা-তন্তু-মজ্জায়-মাংসে রাজাকে গ্রহণ করিনি? রাজা তো বর্মের মতো ঘিরে আছেন আমাকে; অতন্দ্রকিশোর তো চারার মতো বাড়ছেন আমার অন্দরে, আমার অন্তরে।আমি আপনাকে অভ্যর্থনা করব বলে বেরিয়ে এসেছি, রাজা কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দেননি।এবার, আমি কেন বেরিয়ে এসেছি জিজ্ঞাসা করবেন না দয়া করে, আমি বেরিয়ে এসেছি কারণ একজন শিল্পীকে সেখানে গিয়ে নতমস্তকে দাঁড়াতেই হয়, যেখানে তার শিল্প আগেই পৌঁছেছে।

-কিন্তু আমি আজ আর কেবলমাত্র শিল্পানুরাগীই নই অধরা। আমি যে আজ তোমার ভক্ত, তোমার প্রেমিক, তোমার দিওয়ানা। তুমি আমার বুকের উপর পা না রাখলে আমার নিশ্বাস নেওয়া সম্পূর্ণ হবে না, তুমি আমার গলায় ঠোঁট না ছোঁয়ালে আমার পিপাসা মিটবে না। অনন্ত রাত্রির কিনারে আগুন ছাড়া জ্বলে ওঠা মশাল তুমি আমার কাছে এসো, আরও কাছে...

অধরা অসীম বিস্ময়ে লি ইউয়ানের রূপান্তর দেখছিল তখনই নগরের ভিতর থেকে একটা মশাল ছুটে এল ওর পর্ণকুটিরের দিকে। তারপর আর একটা। আরও একটা।

-ও অভিলাষার রাজা, তুমি এ কী করলে? আমি পুড়ে মরলে যে আমার আর তোমার ভিতরকার সেতুও ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমার উত্তরাধিকারে কেবল শাসন থাকবে, সুর থাকবে না? অধরা স্বগতোক্তি করল।

মুহূর্তের মধ্যে পর্ণকুটিরটাই একটা মশালে বদলে গেল।

তার একটা ফুলকি হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে লি ইউয়ান আবৃত্তি করে উঠলেন, “তাকে ধরা যায় না, ধরা যায় না, যায় না,/ কারণ সে অধরা” ...
আগুন তখন অধরার পায়ের নূপুর আর হাতের বালা হয়ে নাচতে শুরু করেছে।

৩

-জেনি ডি’সুজা, শ্রুতি শেঠি, শালিনী কালে; তোমার আসল নাম কোনটা?
-যা ডাকলে সুবিধা হয় আপনি ডাকতে পারেন মিস্টার অভিনব মালহোত্রা, রিটায়ার্ড কমিশনার অফ পোলিস!
-রিটায়ার্ড শব্দটার উপর অত জোর দেবার দরকার নেই, আমি এখনও সার্ভিসে থাকা অফিসারদের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে পারি।
-সে জানি। নইলে দেড়দিনের মধ্যে ইন্ডিয়া থেকে ইওরোপ চলে আসতে পারেন, জাস্ট ছেলের পাঠানো একটা ছবি দেখে?
-দেখো রুবি, হ্যাঁ ওই নামেই ডাকতাম আর ডাকব, আমার ছেলে আমার মতো শক্তপোক্ত নয়। একটু ইমোশনাল চ্যাপ। ওর মায়ের ধাতটা পেয়েছে আসলে।
-তাতে ক্ষতি কী?
-ক্ষতি অনেক। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কঠিন আর নির্মম না হলে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও, ছেলেটা আমার নরম-তরমই রয়ে গেল। তা নইলে তোমার পাল্লায় পড়ে?
-আপনি তো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমানদের একজন। আমার পাল্লায় পড়েছিলেন কীভাবে একটু বলবেন?
-আমি পাল্লায় পড়িনি। আমি এনজয় করেছি তোমার সঙ্গে।
-কোনও দায়দায়িত্ব না নিয়ে?
-ফুর্তির সঙ্গে দায়দায়িত্ব যায় না তো। যেখানে দায়দায়িত্ব শেষ, সেখানেই ফুর্তির শুরু।
-বাড়িতে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও এইভাবে কথা বলেন বুঝি?
-সেটা তোমার জানার দরকার নেই। কিন্তু তোমার থেকে আমার যেটা জানা দরকার তা হল, তুমি আমার ছেলেকে রুলেটের চারনম্বর খোপেই টাকা রাখতে বললে কেন? এখানেও কি সেই ক্রিকেট ম্যাচের মতো আগে থেকে খবর ছিল?
-না। কিন্তু দীর্ঘদিন চায়নাটাউনের একটা থ্রি-স্টারে ডান্সার হিসেবে ছিলাম তাই জানি, সংখ্যা হিসেবে ‘চার’ কতটা অপছন্দের চিনেদের কাছে। চিনা ভাষায় ‘Si’ বললে চার বোঝায়। আবার ওই একই শব্দ সামান্য ভিন্ন উচ্চারণে মৃত্যুও বোঝায়। জানি না, এই দুইয়ের মধ্যে কতটা যোগ আছে কিন্তু অনেক চাইনিজই তিন’এর পর পাঁচে চলে যেতে পছন্দ করেন। অনেক বহুতলে নাকি চারনম্বর ফ্লোরটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়, লিফট থামে না সেখানে।
-তুমি তো ‘চার’এর উপরে ডক্টরেট করেছ দেখছি!
-করিনি। করার প্রবৃত্তি হয়নি। একটা ‘চার’ তো আমার জীবনটাও শেষ করে দিল।
-তার জন্য কে দায়ী, রুবি? কেন তুমি মিডিয়ার সামনে বলতে গেলে যে মুম্বাই প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল ম্যাচের ফার্স্ট ইনিংসটা শেষ হবে একটা বাউন্ডারি দিয়ে?
-আমি ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম, দীনেশ দেশমুখকে। বলেছিলাম কারণ লোকটা আমার শিল্পের কদর করত; আমার সঙ্গে শুতে নয়, আমার নাচ দেখতে আসত।
-তাহলে তোমায় ফাঁসাল কেন? কেন লুকনো ক্যামেরায় তোমার ছবি তুলে সেটা চালিয়ে দিল চ্যানেলে?
-বলতে পারব না। হয়তো আমাকে একদিন রাতে আপনার সঙ্গে লিফটে উপরে উঠতে দেখে, কিছু আন্দাজ করেছিল। জীবনে এরকম হয়, আমি দেখেছি, ফ্যানরা যখন প্রেমিক হয়ে ওঠে।
-সেটা ভিখিরিদের ডাকাত হয়ে ওঠার চাইতেও খতরনাক তা মানছি। বাট ফার্স্ট অফ অল, ওই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানটা তোমার সঙ্গে শুয়ে যা বলে ফেলেছিল তোমার সেটা আমাকে জানানো উচিত ছিল।
- আপনার সঙ্গে বিছানায় যাবার পর থেকে আমি আর কারও সঙ্গে শুইনি বম্বেতে। আমি প্রস্টিটিউট নই, হলে পরে কোটি টাকা নিয়ে যারা সাধাসাধি করত তাদের ফেরাতাম না।

-আমায় ফেরাওনি কেন, আমি তো টাকা অফারই করিনি তোমাকে!
-বি'কজ আই অ্যাম অ্যান আর্টিস্ট। আর শিল্পীরা যাদের প্রতি আকর্ষিত হয় তাদের টাকা দেখে না। আপনার ওই আকাশি নীল চোখের মণি দেখে আমার মনে হয়েছিল ওই চোখ আমার সন্তানের মধ্যেও চাই। সো আই গট প্রেগন্যান্ট বাই ইউ।
- সেটাও তোমারই জেদ। কিন্তু তুমি আমাকে কেন জানালে না ওই বেটিং'এর ব্যাপারটা?
-কারণ আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি যে সিরিয়াল বম্ব ব্লাস্টের কিনারা করা একটা লোক, যে ক্রিমিনালদের ধরে ধরে লক-আপের ভিতরে পুরে দেয়, সেই আবার ক্রিকেট জুয়ার সঙ্গেও যুক্ত।
- একসঙ্গে সব ফ্রন্টে লড়াই করা যায় না, রুবি।
-মিথ্যে বলবেন না প্লিজ। আপনি ওই বেটিঙের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন টাকার নেশায়। জানেন আপনার প্রেমে পড়েই আমি কখনও আপনাকে 'তুমি' করে বলিনি, 'আপনি' করে ডাকতাম, এমনকি আমাদের সঙ্গমের সময়ও! কিন্তু ওই বেটিং চক্রের সঙ্গে আপনি জড়িত জানার পর, 'তুই' বলে খিস্তি দিতে ইচ্ছে করছিল।
-ব্যাপারটা, তুমি যেরকম ভাবছ সেরকম নয়। হ্যাঁ, আমি জানতাম যে ফাইনালের ফার্স্ট ইনিংসের লাস্ট বলে একটা চার মারা হবে আর সেটা জেনে আমি চুপচাপ কিছু টাকা লাগিয়েছিলাম, জুয়ায়। দ্যাটস ইট।
-কিন্তু ফাইনাল চলাকালীন যখন দীনেশ দেশমুখের চ্যানেল আমার ইন্টারভিউটা ফ্ল্যাশ করে দিল, তখন যে প্লেয়াররা জড়িত ছিল তারা সাবধান হয়ে গেল ! বাউন্ডারি আর হয়নি।
-হয়নি তো। ওই না হবার জন্য কতলোকের কত টাকা লস হয়েছিল, কোনও ধারণা আছে তোমার?
-আর বাউন্ডারি হয়ে যাওয়ার পর খবরটা ফ্ল্যাশ হলে দেশের সম্মান কোথায় থাকত, ভেবেছেন একবারও?
- সব ভাবনার দায় কি আমার একার?
-আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমার মনে হয় যে সেদিন ওই ইন্টারভিউটা বেরিয়ে যাওয়ার ফলেই অতবড় কেলেঙ্কারিটা হয়নি।
-যা হল তার মূল্য দীনেশ কদমকে নিজের প্রাণ দিয়ে দিতে হল। আর তোমাকে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে দিতে হচ্ছে।
- আপনি তারপর থেকে আর একবারও খোঁজ নিয়েছেন আমার?
-তোমার নিরাপত্তার স্বার্থেই নিইনি।
-মিথ্যে কথা।
-একশো শতাংশ সত্যি।আমি কলকাঠি না নাড়লে, রাতারাতি বিদেশে আসতে পারতে? আসার আগে দশলাখ টাকা পাওনি?
-কোত্থেকে দিয়েছিলেন সেটা? নতুন বেটিং?
-না। দীনেশের খুনের ব্যাপারে আমি চুপ করে থাকব সেই শর্তে অনেকটা টাকা দেওয়া হয়েছিল আমায়।
-সেই টাকাতেই রিটায়ারমেন্টের পরপরই ভিলে পার্লের ফোর-বেডরুম? ভাল। কিন্তু তাহলে ওই ফ্ল্যাটের একটা ঘরে মুগ্ধা থাকবে না কেন?
-কে মুগ্ধা?
-আমার আপনার মেয়ে, স্যার। আর আপনার ছেলে যা ইনহেরিট করেনি আপনার মেয়ে সেটা পুরোপুরি ইনহেরিট করেছে। আপনার ওই আকাশ নীল চোখ। এবার ওরকম চোখ নিয়ে ও কতদিন আমার কাছে থাকবে? বিশেষ করে আমি যখন বুঝতে পারছি যে আমার খুব শিগগিরই দীনেশ দেশমুখের অবস্থা হতে চলেছে।
-বন্ধ করো, এই সমস্ত ননসেন্স। আর আমায় বলো তুমি ইওরোপে এসেও কেন আবার নাচতে শুরু করেছ?
-আপনার দেওয়া ওই দশলাখ টাকায় একবছরও চলেনি তাই। আর আমি নাচ ছাড়া অন্যকিছু জানি না বলে। কিন্তু সেদিন একটা শো'র পর আমি কালুয়া আর বিচ্ছুকে অডিয়েন্সের ভিড়ে দেখতে পাই। এবং একইসঙ্গে দেখতে পাই, বেদান্তকে। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম আমার ওকে পটাতে হবে, স্রেফ আর একবার আপনার মুখোমুখি হবার জন্য।
-তুমি ওকে চিনলে কী করে?

-দেশ ছেড়ে চলে আসার আগে, আপনার সব বারণ অগ্রাহ্য করে, আমি একদিন আপনার বাংলোয় গিয়েছিলাম। তখনও আপনি রিটায়ার করেননি, প্রচুর সিকিওরিটি গেটে আর তারা আমায় ঢুকতেই দিল না। সেই সময়ে আমি যাকে বলে, 'হেভিলি প্রেগন্যান্ট' কিন্তু একশো তিরিশ কোটির দেশে মাতৃত্বের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরাও কোনও স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পায় না; বিশেষ করে তারা যদি ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়। সেদিন বেদান্ত জগিং সেরে ফিরে আসার মুহূর্তে আমায় দেখে , ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। এক কাপ কফি আর চারটে বিস্কুটের ব্যবস্থা করে ছিল। আমি তখনই টের পেয়েছিলাম যে ও আমার সন্তানের খুব রেসপন্সিবল একজন দাদা হবে।

-তুমি ওকে ভালবেসে ফেলেছ কি না জানি না, কিন্তু ওর ভিডিও কলে যা বুঝলাম, ও তো তোমার প্রেমে বাওরা হয়ে গেছে পুরো। হেড ওভার হিলস যাকে বলে।

-মুগ্ধাকে দেখলে, মুগ্ধার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা জানলেই বেদান্ত আবার শান্ত হয়ে যাবে। আপনার মতো ডেয়ার-ডেভিল নয় তো!

- মুগ্ধা কোথায়?

-একটা স্কুলে যাদের হোস্টেল ফেসিলিটিজও আছে। আমি ওকে নিজের কাছে রাখতে ভরসা পাইনি।

-আমি রাখব কোন পরিচয়ে?

-যে পরিচয়ে ইচ্ছা। কিন্তু ওকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে।

-তুমি কি জোর করছ? মিডিয়ায় যাবে, না নিয়ে গেলে?

-জানি না। হয়তো খুনও করে ফেলতে পারি । কারণ আমার মেয়ের উপর কোনও আঁচ এসে পড়ুক ,আমি চাই না। আপনি কেন বুঝছেন না, আমার লাইফের কোনও নিশ্চয়তা নেই। ইনফ্যাক্ট কারও লাইফেরই নেই কারণ একটা ভয়ঙ্কর ভাইরাস উড়ে আসছে হাওয়ায় আর এটাকে এখনও কেউ খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও শিগগিরই কেঁদে কূল পাবে না। আমি শুনেছি , এই ভাইরাস মানুষের দম আটকে তাকে মেরে ফেলে। এবার আমায় মারলে কই পরোয়া নহি, যদি মুগ্ধার জীবনটা নিরাপত্তার ঘেরাটোপে চলে আসে। আর আপনি বলতে পারছি না, তুমি প্লিজ ওকে ইন্ডিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও, প্লিজ। তারপর আমি ভিড়ে বা ভাইরাসে মিশে যাব, অনেক অনেক মৃত বা জীবিত মানুষের একজন হয়ে দূর থেকে হেসে উঠব। শেষ ইচ্ছে একটা আছে, কিন্তু ওটা বেদান্তর দায়িত্ব, তুমি শুধু মুগ্ধার ব্যাবস্থা করো।

-কাশছ কেন এত? কী হয়েছে তোমার?

-বুঝতে পারছি না। সাঙ্ঘাতিক একটা ড্রাই কাফ। ক'দিন ধরেই। গলা থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে দেয়।

-জল খাও একটু। তোমার তো জ্বরও আছে, দেখছি।

-যা খুশি থাক। আই ডোন্ট কেয়ার। আমি শুধু ভাবছি তোমার ফ্ল্যাটে মুগ্ধাও যখন থাকবে তখন, একটা ফ্ল্যাটে চার-চারটে আকাশ-নীল চোখ। দারুণ দৃশ্য হবে কিন্তু। এই যে নিজের মেয়ের ছবিটা দেখো আমার মোবাইলের স্ক্রিনসেভারে। আরে হলটা কী, চোখ সরিয়ে নিচ্ছ কেন, দিস ইজ ইয়োর ডটার, মুগ্ধা। চোখ দেখে চিনতে পারছ না?

৪

অভিনব মালহোত্রা নিজের পিস্তল থেকে নিজের মাথায় একটিই গুলি করেছিলেন। আর ওঁর সুইসাইড নোটে দুটোই মাত্র লাইন ছিল, "একটা ফ্ল্যাটে চারটে নীল চোখের প্রয়োজন নেই। আমার চোখের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নতুন চোখ দুনিয়া দেখুক"।

বাবা হঠাৎ করে ইওরোপে কেন এলেন, প্লেন ল্যান্ড করার পর থেকে প্রায় আটঘণ্টা কোথায় ছিলেন, রাতে বাড়ি ফিরে ছেলের মাথাটা দু'হাত দিয়ে টেনে নিয়ে কেন চুমু খেলেন আর কেনই বা রাতারাতি দেশে ফিরে গিয়ে এমন কাণ্ড করলেন, সবকিছুই ভীষণ অস্পষ্ট ছিল যতক্ষণ না মুগ্ধা সামনে এসে দাঁড়াল।

সবাইকে পুলিশি ঝামেলা থেকে বাঁচানোর জন্যই যে অভিনব মালহোত্রা দেশে ফিরে গিয়ে কাজটা করেছেন, তাই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তিনবছর আগের একটা স্ট্রোকের কারণে বেদান্তর মা আর কাউকে চিনতে পারেন না, তাই মুগ্ধা তাঁর কাছে বেদান্তর মতোই অপরিচিত হিসেবে প্রতিভাত হল এবং তাতে অসুবিধে বিশেষ হল না। অসুবিধে হল, মুগ্ধার মা যে পান্ডুলিপিটা বেদান্তকে দিয়ে গিয়েছিল সেটা একজন প্রকাশক বের করতে আগ্রহী হলেও, লেখিকা আর প্রকাশকের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া গেল না কারণ জেনি ডি ডি'সুজা ওরফে শ্রুতি শেঠি ওরফে শালিনী কালের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রীতি সালগাঁওকার নিশ্বাস নিতে না দেওয়া পৃথিবীতে, নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেয়। ঘটনাগুলোর প্রবল আকস্মিকতায় আঠাশের বেদান্ত এবং আট বছরের মুদ্রা নিজের নিজের মতো করে চুরমার হয়ে গেলেও জাগতিক নিয়মেই যে যার মতো করে সামলে নিয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে, বাঁচার ইচ্ছায়।

বিশ্বজোড়া মৃত্যুমিছিলের মধ্যে ওই বাঁচার ইচ্ছাই অসম্ভবকে সম্ভব করায়। বেদান্ত , প্রীতির 'হিন্দি' পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে বিস্মিত হয়ে যায় অতীত আর বর্তমানকে একজন অল্পশিক্ষিত নর্তকী, কল্পনা দিয়ে কীভাবে মিলিয়ে দিয়েছে দেখে! নর্তকী নাকি শিল্পী?

বেদান্তর মনে হয় বইটা হিন্দির চাইতে ইংরেজিতে বেরোলে পৃথিবী জুড়ে সাড়া পড়বে। চারদিকের দরজাগুলো যখন বন্ধ হচ্ছে তখন ও নিজের ভিতরের দরজাগুলো খুলতে শুরু করে। অনুবাদের আলোয় অতন্দ্রকিশোর আর অধরা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে শুরু করে। প্রীতি সালগাঁওকারের মুখটার মতোই।

...

বেদান্তর অনুবাদ যখন শেষ পর্যায়ে তখন একটা ছাদ থেকে লাফিয়ে আর একটা ছাদে যেতে গিয়ে মারা যায় ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল কালুয়া। আর তার কাছ থেকে পাওয়া কাগজপত্র খুঁড়তে খুঁড়তে মিডিয়া অভিনব আর প্রীতির 'প্রেমকাহানি' খুঁজে পায়। প্রচারের চড়া আলোয় সেটা কেচ্ছার রূপ নেয়। পুলিশমহলের ভিতরেও ভাল নড়াচড়া হয়।

কেবলমাত্র বেদান্ত আর মুগ্ধার মনে কোনও রেখাপাত হয় না ঘটনাটার। মুগ্ধা ভোরবেলা নিজের গানের রেওয়াজে বসার আগে একবার ড্রয়িং রুমে অভিনব মালহোত্রার ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কখনও না-দেখা বাবাকে জিজ্ঞেস করে, একটা বাড়িতে চারটে নীল চোখ একসঙ্গে কেন থাকতে পারবে না? এখনও তো একসঙ্গেই আছে। শুধু দুটো নীল চোখ ফ্রেমের বাইরে আর দুটো ফ্রেমের ভিতরে।

ভোর-ভোর দৌড়নোর জন্য আবার বেরোতে শুরু করে বেদান্ত। যারা বহুদিন দৌড়নো ছেড়ে দিয়েছিল তাদের একজন-দু'জন ফের জড়ো হতে শুরু করেছে ইদানিং। যতদিন যাবে আরও লোক আসবে। একদিন অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পা রেখেই বেদান্তর মনে হয়, প্রীতির গল্পে নায়িকা মারা গিয়েছিল কেবল। বাস্তব নায়ক-নায়িকাকে মিলিয়ে দিয়েছে। হয়তো জীবনে নয়, মৃত্যুতে; তবু মিলিয়েছে তো।

বেদান্তর ভাবনার ভিতরেই সামনের গাছটা থেকে ফুল ঝরে পড়ে। রাত শেষ কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, এরকম সময়েই আবহমানকাল ফুল কুড়িয়ে আসছে মানুষ। বেদান্তও নিচু হয়ে অন্ধকারের ভিতর হাত ডোবায় ফুলের জন্য। এক, দুই, তিন, চার...

মুঠোটা প্রায় ভরে আসে। বেদান্তর মনে হয়, আর বেশি ফুলের জায়গা হবে না। আর বেশি ফুলের দরকার নেই।

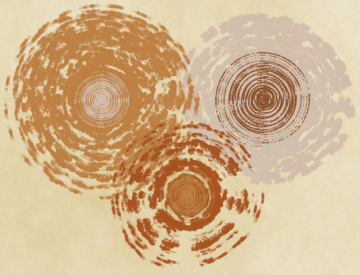

রবীন্দ্রনৃত্য-এক অবিনশ্বর কালজয়ী নৃত্য শৈলী

শ্রেয়সী দাস

রবীন্দ্রনৃত্য আর পাঁচটা সাধারণ নৃত্যের ধারার থেকে ভিন্ন। এটি ভিন্ন তার গতি, প্রকৃতি ও চলনে। রবীন্দ্রনৃত্য তার পরিবেশনার একান্ত নিজস্ব ধরণ ও সাবলীলতায় দর্শকের আত্মাকে স্পর্শ করে। এটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্ন শিল্পকর্মের মতোই কোনো প্রাদেশিকতায় আবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের সাতটি চিরায়ত বা ক্লাসিকাল নৃত্যশৈলীর এবং প্রচলিত লোকনৃত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনৃত্যে ব্যাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ তার নিজের ভাষায় রবীন্দ্রনৃত্য নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন যে রবীন্দ্রনৃত্য হলো এমন একটি নৃত্য শৈলী যা বিশুদ্ধ আনন্দ ও মুক্তির প্রকাশ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রসংগীত সহকারে অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশকে চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনৃত্য বলা হয়ে থাকে ।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলিকে একটু কাছ থেকে বিশ্লেষণ করলেই তার সর্বগ্রাহিতার বৈশিষ্টগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনৃত্য তার শিল্পের অন্যান্ন ধারার মতোই ক্রমবিবর্তমান ও নতুনের দিশারী । সে জন্যই হয়তো তার মঞ্চস্থ নৃতনাট্যগুলি প্রতিবার নতুনত্বের ছাপ রেখেছে উপস্থাপনায় ।

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে বহুল প্রচলিত নৃত্যনাট্যগুলি হলো কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, বাল্মীকি প্রতিভা, শ্যামা এবং চিত্রাঙ্গদা। চিন্ত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা এই তিনটি নৃত্যনাট্য

রবীন্দ্রনৃত্যের নিউক্লিয়াস ও সার্বিকভাবে রবীন্দ্রনৃত্যের শৈলীকে বহন করে।

রবীন্দ্রনৃত্য প্রকৃতঅর্থেই মনিপুরী, কথাকলি, মোহিনীনাট্যম, ভরতনাট্যম, কত্থক প্রধানত এই পাঁচটি চিরায়ত বা ক্লাসিকাল নৃত্যশৈলীর মিশেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দক্ষিণবঙ্গের বাউল নৃত্য, উত্তরবঙ্গের জরি ও রায়বংশী নৃত্য এবং গুজরাটের গার্বা নৃত্যের আঙ্গিকের অভিযোজন রবীন্দ্রনৃত্যে চোখে পরে। রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্য বিভিন্ন সময়ে বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্ম-চিন্তন, আধ্যাত্মিক মৌলবাদ, টপ্পা, ধামাল ও পাশ্চাত্য সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনৃত্যের ভঙ্গি ও প্রকাশে মানব মনের প্রতিটি অনুভূতি যেমন দুঃখ, রাগ, অনুরাগ, অভিমান, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে পরিবেশিত। যেমন মনিপুরী নৃত্য ভক্তিরসের প্রকাশে, কথাকলি নৃত্য বীর রসের প্রকাশে, ভরতনাট্যম তার অভিনয়ের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনৃত্যকে তার অদ্বিতীয়তায় সিক্ত করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এইসব নৃত্যশৈলীর যেটুকু রবীন্দ্রনৃত্যের ভাবের সাথে সহবাস করে, কেবল সেটুকুই তাতে সিঞ্চন করেছেন আর বাকিটা বাদ দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। আবার রবীন্দ্রনৃত্যে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের অন্যান্য অনেক দেশের প্রধান নৃত্যশৈলীগুলোর প্রভাব লক্ষিত ।

শেষত রবীন্রনৃত্য ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্যশৈলীর ধারায় সময়ের পরিধিতে একটি আধুনিক নৃত্যশৈলী হলেও এটি বর্তমানে একটি নতুন ক্লাসিকাল ফর্ম হিসেবে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনৃত্য রবীন্রনাথের অন্যান্ন শিল্পসৃষ্টির মতোই তার শীর্ষ মানের ভাব-মানসের ধারায় সিঞ্চিত ও সেই কারণেই এক চির অবিনশ্বর কালজয়ী নৃত্য শৈলী হিসেবে সময়ের দলিলে থেকে যাবে চিরকাল।

প্রশ্ন

শর্মিলা গুপ্ত

এখন যখন তখন হবে,
আমায় ভালোবাসবে কি
এখন যখন তখন হবে,
আমার হাতটি ধরে থাকবে কি?

মোর দৃষ্টি যখন ক্ষীণ হবে,
মুষ্ঠি যখন শিথীল হবে,
রূপের বাহার ম্লান হবে,
তখন সাথে থাকবে কি?

যৌবনের এই মাদকতায়
বলছো মধুর মিষ্টি কথা,
স্বপ্ন রঙিন দেখাচ্ছ যে
অরূপ রতন শব্দে গাঁথা।

এই জীবনের ঝড় ঝাপটায়
পথটি যদি হয় দুর্গম,
তখন কাছে থাকবে তো গো,
সাহস নিয়ে সখা প্রিয়ম?

এখন ও তখনের মাঝে
যে সুদুর যাত্রা করতে হবে,
ভেবো দেখো তাই অতল মনের তলে,
সাথে থাকবে কি সেই শেষ বেলায়

আমার চোখে আনন্দধারার পঁচিশ বছর

সৌমিক বসু

কথায় বলে অস্ট্রেলিয়ার বুমেরাং এমন এক অস্ত্র যা হাত থেকে বেরিয়ে গেলে লক্ষ্যভেদ করে আবার ফিরে আসে নিজের কাছে। আমার সাথে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কটাও ঠিক যেন কতকটা একই রকম। প্রায় এক যুগ আগে ২০১০ সালে প্রথম আসি এই দেশটাতে। তারপর থেকে বার তিনেক এদেশ থেকে পাঠ চুকিয়ে চলে গেলেও বুমেরাং এর মতনই কর্মসূত্রে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি।

আর যতবারই ফিরে এসেছি, অবধারিতভাবে একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে প্রবাসে বসে বাংলা সাহিত্যের স্বাদ আহরণ করতে নির্ভর করেছি আনন্দধারার উপর। সে প্রথম দিককার বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর স্টলের থেকে পাওয়া পূজাবার্ষিকী হোক বা আনন্দধারা লাইব্রেরী থেকে নেওয়া কোন বই হোক, সবারই আবেদন আমার কাছে একই রকম। আমার কাছে আসলে আনন্দধারা এই দূর পরবাসে একটুকরো কলেজস্ট্রিট, বা একটুকরো কলকাতা বইমেলা। আবার একুশে ফেব্রুয়ারির মতোন কোনো বিশেষ দিনে যখন আনন্দধারা লাইব্রেরীতে সমমনস্ক সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুদের চা-য়ের সঙ্গে টা-র সহযোগে আড্ডা জমে ওঠে, চলতে থাকে স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ পাঠের আসর, তখন আনন্দধারা আমার কাছে হয়ে ওঠে এক টুকরো কফি হাউস বা সিডনির বুকে এক পশলা শাহিনবাগ।

আর যে কর্মকাণ্ডের কথা না বললেই নয়, তা হোলো বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা বা বিতর্কাড্ডা। যেখানে বিষয় নির্বাচনে সব সময় অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে “প্রকৃত শিক্ষা,” এন্টারটেনমেন্টের থেকে এনলাইটমেন্ট কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কখনো তা আমাকে

সাহায্য করেছে রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে জানতে, মহামারীর সময় জনস্বাস্থ্য কর্মী ও সমাজসেবী হিসেবে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হতে, আবার কখনো তা নতুনভাবে ভাবিয়েছে অর্থনীতি সম্পর্কে , সাহায্য করেছে অর্থের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে বোধ জন্মাতে , আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীদের কর্মকাণ্ডের আলোচনা ও স্মরণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। সর্বশেষ সংযোজন ডোকরা শিল্পের মতন লুপ্তপ্রায় শিল্পের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে এক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং সক্রিয়ভাবে শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার।
তবে গ্রাহক বা পাঠক সত্ত্বার ঊর্ধ্বে উঠে আমার সাথে আনন্দধারার নিবিড় সখ্যতার শুরু যে পর্বের মাধ্যমে, সেটি ছিল এরকমই একটি বিতর্কাড্ডার আসর, যার বিষয় ছিল "জীবনমুখী কবিতা।" এই প্রসঙ্গে আমারই একটি পুরোনো লেখা থেকে সেই দিনটি সম্পর্কে দু-চার কথা স্মৃতি রোমন্থনের লোভ সামলাতে পারছি না। ওভার টু আনন্দধারা লাইব্রেরী ২৩ শে নভেম্বর, ২০১৯ ।

আনন্দধারা লাইব্রেরী, ২৩ শে নভেম্বর, ২০১৯

কথায় আছে, আমরা বাঙালিরা জীবনযাপনের মতোন শয়নে, স্বপনে কবিতা যাপন করি। আর কৈশোর বা যৌবনে দু দন্ড শান্তি দিয়েছিল এমন কোন নারী চরিত্রের আবির্ভাব কারোর জীবনে ঘটেনি, এমন ঘটনা সত্যি বিরল। সেই নারী কখনো শেষের কবিতার লাবন্য , কখনো বনলতা সেন, আবার কখনো বা নীরা। তাই তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন লেখেন, “নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ”, মনে হয় আমাকে নিয়েই বলছেন, আবার
“ভ্রু পল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে “, পড়ে মনে হয় এ তো আমারই জীবন থেকে তুলে আনা ঘটনা। যাই হোক কর্মজীবনে যোগ দেওয়ার পরে বিভিন্ন কারনে কবিতা চর্চায় কতকটা ঘাটতিই পরেছিল বলা চলে, অন্তত এভাবে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে কবিতা নিয়ে আলোচনা শেষ কবে করেছিলাম সত্যি মনে নেই। তাই আনন্দধারা রীডার্স ফোরাম আয়োজিত কবিতা নিয়ে বিতর্কাড্ডার আমন্ত্রণ পেয়ে কবিতাকে জীবনানন্দের ভাষায় ঠিক এই কথাগুলোই বলতে ইচ্ছে হয়েছিল ...
“জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার,
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার “

এদিকে এককালের শব্দ ও ছন্দের “নদী আপন বেগে পাগল পারা” চর্চার অভাবে প্রায় অন্তঃসলিলা সরস্বতী বা ফল্গু নদীর রূপ নিয়েছে। আবার স্মরণে এলো কবি জয় গোস্বামীর সেই অমোঘ কবিতা।
“ঘাড় গুঁজে দিন, লিখতে লিখতে
ঘাড় গুঁজে রাত, লিখতে লিখতে
মুছেছে দিন , মুছেছে রাত
যখন আমার লেখবার হাত
অসাড় হল,
মনে পড়ল
সাল কি তারিখ, বছর কি মাস
সেসব হিসেব আর ধরিনি

লেখার দিকে তাকিয়ে দেখি
এক পৃথিবী লিখব বলে
একটা খাতাও
শেষ করিনি ”

যাই হোক দুরুদুরু বক্ষে খেরোর খাতায় বক্তব্য লিখে নিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম অনেকেরই আমার মতোনই লাস্ট মিনিট সাজেশনের উপরে ভরসা। আবার অসীমদা, দেবুদা, লালিদির মতোন বর্ষীয়ানরা শুধু অভিজ্ঞতা থেকে তুলে আনা কথা বলে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন। অনুষ্ঠানের নাম বিতর্কাড্ডা হলেও বিতর্ক কম, আড্ডা বেশি হোলো, বিভিন্ন আঙ্গিকে কবিতা নিয়ে আলোচনা হোলো, অনেক নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হোলো, অনেক চেনা মানুষের অচেনা কবিসত্ত্বার পরিচয় পেলাম, উপরি পাওনা দুর্দান্ত কিছু কবিতা পাঠের সাক্ষী হওয়া। শ্রীমন্তদা এবং আনন্দধারাকে ধন্যবাদ দুর্দান্ত একটা মনোজ্ঞ সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্যে যেখানে বহুকাল আগে ফেলে আসা নুড়ি পাথরগুলি আবার নাড়া চাড়া করার সুযোগ পেলাম। কলকাতা থেকে সুদুর সিডনিতে এসে কবিতার প্রতি যত্নবান এই মানুষদের প্রত্যেককে কুর্নিশ মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতন কবিতাচর্চাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এদের সাথে গলা মিলিয়ে সুনীলদার মতো করে কবিতা সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা করে,
(কবিতার প্রতি) “আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না , মৃত্যু হয় না ।
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না,
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম । “

এত কিছু কথার পরে বাড়ী ফেরার সময় বাঙালির সাহিত্যের আকাশে যিনি শাশ্বত ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলছেন তাঁর সেই কালজয়ী কবিতা মনে পড়লো .....
“রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে। “

সত্যি আমাদের সবার মধ্যেই কবিসত্তা, সাহিত্যিক সত্তা লুকিয়ে আছে আর ঠিক সেরকম আধুনিক, ধ্রুপদী সব কবিতাতেই মিশে আছে জীবনের নির্যাস, আমাদের চলার রসদ।
ফিরে আসি আনন্দধারার কথায় । জন্মলগ্ন থেকে পট পরিবর্তন অনেক হয়েছে এই পঁচিশটি বসন্তে। ইন্টারনেট এর আবির্ভাব, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন, নোট বন্দি, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, শবরীমালা, নির্ভয়া , ইউপিএ , এনডিএ পেরিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত আনন্দধারা একইভাবে প্রবাহমান। তার চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতা সত্বেও আনন্দধারা সময়ের সাথে চেষ্টা করে এসেছে নতুন ভাবনাকে তুলে ধরার, তাই কখনো পৌনঃপুনিকতার আবর্তে জড়িয়ে যায়নি। বিতর্ক ও চিন্তাকে সে স্থান দিয়েছে সর্বাগ্রে। শুধু চায়ের পেয়ালায় তুফান নয়, বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে সদস্যদের এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতিটি নাগরিককে মগজ এর পুষ্টি জুগিয়ে এসেছে। অনুপ্রাণিত করেছে আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ করতে।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যে চারাগাছটি রোপন করা হয়েছিল, আজ সে একটি পূর্ণ বয়স্ক

মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। অগুনতি শুভানুধ্যায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহু দিকপাল কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের স্নেহ ও সাহচর্য ছাড়া এই রূপান্তর সম্ভব ছিল না। পথ চেয়ে বসে থাকা প্রবাসী পাঠক-এর ঘরে বাংলা সাহিত্যের রেশ পৌঁছে দেওয়ার দায়বদ্ধতা, প্রবাসের কর্ম জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও সাহিত্য, সংস্কৃতি সৃষ্টির নেশা আর সেবার আনন্দ থেকে জন্ম নিয়েছিল "আনন্দধারা"। আজ সময় বদলেছে, হারিয়ে গেছে সেই পথ চাওয়া পাঠক। প্রযুক্তির স্রোতে হারিয়ে গেছে ছাপার অক্ষর, ডাকের চিঠি, বালিশের পাশে রাখা বই। তবু আজও বহমান আনন্দধারা, সাথে এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মতন পত্রিকা “দখিনা”। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে "এই পথ চলাতেই আনন্দ" ।

আনন্দধারার সাথে থাকুন, পাশে থাকুন । আপনাদের শুভেচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা অটুট থাকলে আজ থেকে পঁচিশ বছর পরেও আমরা বলতে পারব "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"।

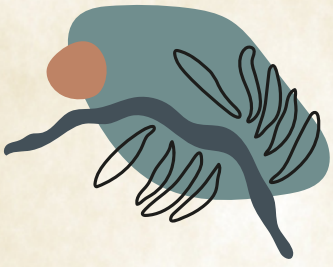

ধন্যবাদ